বারাকাতুদ্‌দোয়া

(দোয়ার কল্যাণসমূহ)

মূল ঃ
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)

অনুবাদ ঃ
মকবুল আহমদ খান

মাহবুব হোসেন
সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বকশী বাজার রোড ঢাকা ১২১১

প্রথম প্রকাশ (বাংলা)
জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬
মে ১৯৮৯

৩০০০ কপি

দ্বিতীয় মুদ্রণ (বাংলা)
জ্যৈষ্ঠ ১৪১১ সাল
রবিঃ সানি ১৪২৫ হিঃ
জুন ২০০৪ ইং

২০০০ কপি

মুদ্রণে **ইন্টারকন এসোসিয়েট্স**
১১/৪ টয়েনবি সার্কুলার রোড
ঢাকা ১০০০

সার্বিক সহযোগিতায়
মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

পুনর্মুদ্রণ প্রকাশে দু'টি কথা

যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের অমূল্য পুস্তক 'বারাকাতুদ্‌দোয়া প্রকাশিত হয়েছিল শতবার্ষিকী জুবিলী উৎসবের (১৮৮৯-১৯৮৯) সময়। অনেক দিন আগেই বইটির মজুদ শেষ হয়ে গিয়েছে। অনিবার্য কারণে পুনরায় ছাপা সম্ভব হয়নি। চাহিদার প্রেক্ষাপটে এখন বইটি আবার ছাপা হচ্ছে। প্রথমবার বইটি যেভাবে ছাপানো হয়েছিল বর্তমানে হুবহু সেভাবেই ছাপা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটে একমাত্র আল্লাহ্‌তাআলার রহমতের বারিধারাই মানুষকে সমস্যাবলী থেকে উত্তরণ করতে পারে আর রহমতের বারিধারা বর্ষিত হয় প্রভু-প্রতিপালকের নিকট কাতর অনুনয়-বিনয় ও দোয়ার মাধ্যমে। তাই 'বারাকাতুদ্‌দোয়া' বইটি পাঠে বাংলা ভাষাভাষী ভাই ও বোনেরা দোয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করলে আমাদের এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে। আল্লাহ্‌তাআলা সকলকে দোয়ার তাৎপর্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

মোবাশ্‌শের উর রহমান
ন্যাশানাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশকের কিছু কথা

"বারাকাতুদ্‌দোয়া" পুস্তিকাখানি রচনা করেন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)।

তখন সময়টা ছিল ইসলামের জন্য অত্যন্ত নাজুক। পশ্চিমা ভাবধারা তখন বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে, চারিদিকে সাড়া জাগাইয়াছে। এর ঢেউ ইসলামেও অনুপ্রেবেশ করিতে শুরু করিয়াছে। একদিকে প্রকৃতিবাদী আধুনিক দর্শনের স্রোত মানুষের মনে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগাইয়া তুলিতেছিল। অপর দিকে বৃটিশ সরকারের আনুকূল্যে খৃষ্টান জগতের অর্থ-বিত্তে সাহায্য পুষ্ট হইয়া ইউরোপ হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে খৃষ্টান পাদ্রীরা আসিয়া ইসলামী জগতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে লাগিল। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খৃষ্টান পাদ্রীগণের ইসলাম বিরোধী আক্রমণের নূতন ধারা ও প্রবাহকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার মত আধুনিক জ্ঞান ছিল না আমাদের আলেম সমাজের হাতে।

শুধু খৃষ্টধর্মের প্রচারই নয় বরং নানা ধর্মের জাগরণ ভারতবর্ষের গগনকে তখন একেবারে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। একদিকে খৃষ্টধর্মের ঢেউ আসিয়া তরঙ্গমালার মত ভারতের বুকে আঁছড়াইয়া পড়িতেছিল। আর অপরদিকে, কি মুসলমান, কি হিন্দু, কি শিখ সব ধর্মের লোকই ভীষণ প্রমাদ গণিতেছিল। ধর্মীয় তর্ক-বিতর্কে সবাই হার মানিতেছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঝানু পাদ্রিদের কাছে। স্বধর্ম রক্ষার জন্য সকলেই ত্রস্ত-ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এই মহা সংকটের সময়ে, সারা ভারতে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল, যিনি পাদ্রীগণকে ধর্মীয় যুক্তি-তর্কে শুধু হার মানাইয়া ছাড়িলেন না বরং খৃষ্টধর্মের অবৈধতা ও অসারতাকে তাহাদেরই ধর্মগ্রন্থাদি হইতে এরূপ অকাট্যভাবে প্রমাণ করিতে লাগিলেন যে, পলায়নপর পাদ্রীগণ ময়দান ছাড়িতে বাধ্য হইলেন। পাদ্রীগণের সব শিক্ষা-দীক্ষা ও নব্য প্রশিক্ষণ সবই এই মহাপুরুষের মোকাবিলায় স্রোতের মুখে তৃণ-সম ভাসিয়া গেল। ইহাতে মুসলমানেরা তো স্বস্তিবোধ করিলেনই, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও ইহাতে স্বস্তি বোধ করিলেন। কেননা, সারা ভারতে খৃষ্টান হওয়ার যে হিড়িক পড়িয়া গিয়াছিল, ইসলাম প্রতিশ্রুত এই মহা-মানবের আবির্ভাবে, তাহা স্তব্ধ হইয়া গেল।

ঐ সময়ে ঢেউয়ের তালে, ব্রাহ্ম-সমাজ নামে একটি নূতন ধর্ম-সংঘের উদ্ভব হইল, যাহা শিক্ষিত মানুষের মনকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করিল। এই ব্রাহ্ম-সমাজ খুবই

কৃতকার্য ও প্রভাবশালী হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, এই মহাপুরুষ শুধু এতটুকুই বলিলেন, এই ধর্মটি মানব-প্রসূত। ইহার কোন ঐশী-ভিত্তি নাই। কাজেই ইহা একশত বৎসরের মাথায়ই প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা আজ আমরা স্বচক্ষে অবলোকন করিতেছি।

ঐ একই সময়ে, বৈদিক হিন্দু ধর্মেরও এক জাগরণ দেখা দিল। ইহার উদ্যোক্তারা নিজেদেরকে আর্য-সমাজী বলিয়া চিহ্নিত করিলেন এবং শুদ্ধি করণের মাধ্যমে অন্য ধর্মাবলম্বীকে বৈদিক ধর্মে দীক্ষিত করার ব্রত নিলেন। এই আন্দোলনের উচ্চতম নেতৃত্বের এক ব্যক্তির নাম ছিল লেখরাম পেশোয়ারী। ইসলামের নামকেও সে সহ্য করিতে পারিত না। ইসলামের মুখে কলঙ্ক-লেপন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর চরিত্র হননই ছিল তাহার প্রচার, বক্তৃতা ও রচনাবলীর প্রধান উপজীব্য। প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) তাহাকে বার বার সাবধান করা সত্ত্বেও শুদ্ধি-আন্দোলনের এই লাগাম ছাড়া নেতা লেখরাম, মহানবী (সঃ)-এর চরিত্র হননে উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। তাহার ঔদ্ধত্য সকল সীমা ছাড়াইয়া গেলে, মহানবী (সঃ)-এর এই অদ্বিতীয় ভক্ত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ), আল্লাহ্‌র দরবারে মর্মাহত হৃদয়ে দোয়া করিয়া, লেখরামের অবস্থা জানিতে চাহিলে, আল্লাহ্‌তা'আলা তাঁহাকে জানাইলেন, 'লেখরাম আগামী ছয় বৎসরের মধ্যে মুসলমানের ঈদ-সংলগ্ন দিনে খোদার ফিরিশ্‌তা কর্তৃক নিহত হইবে এবং তাহার হত্যার রহস্য কেহ কখনও উদ্‌ঘাটন করিতে পারিবে না। বাস্তবেও তাহাই ঘটিয়াছিল। এই পুস্তিকাটির শেষাংশে, কবুলিয়তে দোয়ার হাজার হাজার নিদর্শনের মধ্যে, এই একটি মাত্র নিদর্শন নমুনাস্বরূপ পেশ করা হইয়াছে।

ঐ সময়ে, যাহারা নূতন পশ্চিমা-শিক্ষার অগ্রগামী ছিলেন, তাহারা নব্য দর্শনাদির সহিত ইসলামের শিক্ষার সামঞ্জস্য ঘটাইতে না পারিয়া আত্মরক্ষামূলকভাবে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংমিশ্রণের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। তৎকালীন ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ পশ্চিমা ভাবধারার প্রভাবে 'দোয়া' 'প্রার্থনা' ওহী, 'ইলহাম', 'কুরআনের শিক্ষা' ইত্যাদি ইসলামী বিষয়াদির নূতন নূতন ব্যাখ্যা দিতে লাগিলেন। ইসলামী শিক্ষার অপব্যাখ্যা ও বিকৃতি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি তাই, আল্লাহ্-প্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসাবে ইসলামের সঠিক শিক্ষাকে সকলের কাছে তুলিয়া ধরার অভিপ্রায় ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায়ে নব্বইখানি কিতাব প্রণয়ন করেন।

"বারাকাতুদ্‌দোয়া" পুস্তিকাখানি, স্যার সৈয়দ আহমদ খান মরহুমের লিখিত পুস্তক "আদ্‌দোয়া ওয়াল ইস্‌তিজাবাহ্‌" ও "তাহ্‌রীর ফি উসুলিত্‌ তফসীর" এর সমালোচনা হিসাবে লিখিত। দোয়া, প্রার্থনা, ওহী-ইলহাম, তফসীরুল কুরআন ইত্যাদি বিষয়ে স্যার সৈয়দ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের প্রচারিত ভুল ধারণা ও ভুল ব্যাখ্যা মানুষকে কিভাবে ইসলামের সঠিক শিক্ষা হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া গিয়াছিল, "বারাকাতুদ্‌দোয়া" পুস্তিকায় অতি সুন্দর ও প্রাঞ্জলভাবে তাহা দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

পুস্তিকাখানি পাঠে মানুষ আল্লাহ্‌কে, আল্লাহ্‌র কুদরতকে, দোয়া ও তক্‌দীরের সঠিক তাৎপর্যকে এবং কুরআন করীমের ব্যাখ্যা-নীতিকে সঠিকভাবে বুঝিবার তৌফিক লাভ করিবে এবং ঐসব বিষয়ে যদি কাহারও কোন ভুল ধারণা থাকে তবে তাহা নিশ্চয়ই দূরীভূত হইয়া যাইবে বলিয়া মনে করি।

পুস্তিকাখানি বহু পূর্বেই ইংরেজীতে অনুবাদ করা হইয়াছে। বাংলায় ইহার অনুবাদ করিয়াছেন মোহ্‌তারম জনাব মকবুল আহ্‌মদ খান। এই অনুবাদ প্রকাশ করিতে পারিয়া আমরা নিজদিগকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করিতেছি, আর এজন্য করুণাময়ের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এদেশের ভাই-বোনেরা ইহা হইতে উপকৃত হইলে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টাকে সার্থক মনে করিব। আল্লাহ্‌তাআলা যেন ইহাই করেন।

খাকসার

শাহ্‌ মুস্তাফিজুর রহ্‌মান
সেক্রেটারী প্রণয়ন ও প্রকাশনা
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

স্যার সৈয়দ আহমদ খান, কে.সি.এস. আই কর্তৃক রচিত পুস্তিকা
"আদ্‌দোয়া ওয়াল ইস্‌তিজাবাহ্"- (দোয়া ও ইহার কবুলিয়ৎ)
এবং
"তাহ্‌রীর ফী ওসূলিত্ তফসীর"- (তফসীরের নীতিমালা)-এর

সমীক্ষণ

নিজের বিশেষ যুক্তি-ধারা-কারাগারে
বন্দী তুমি; সামর্থ্যের করোনা বড়াই,
আশ্চর্য এ গম্বুজের নীচে, তব সম
বহু জন অতীতেও পায় নাই ঠাঁই।
ঠিকভাবে আল্লাহ্‌কে না জেনে, ঐশী আবাসে
প্রবেশের চেষ্টা কর কোন্ যে সাহসে?
ঐশী গোপন-তত্ত্ব প্রকাশিত হয়
শুধু তারি কাছে, যেই জন খোদা হতে আসে।
কুরআনের **মর্ম স্পর্শ** নিজে নিজে করা
এরূপ করোনা চিন্তা, ব্যর্থ অনর্থক,
নিজ হতে যেই জন অর্থ করে খাড়া
পূতিগন্ধ, মৃত-পচা, তাহা অরোচক।

সৈয়দ সাহেব উপরে বর্ণিত তাঁহার পুস্তিকাদ্বয়ে দোয়া সম্বন্ধে নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, দোয়া কবুল করার অর্থ ইহা নহে যে, দোয়াতে যাহা চাওয়া হইয়াছে, আক্ষরিকভাবে তাহাই পাওয়া যাইবে। কারণ দেয়ার মধ্যে যাহা চাওয়া হইয়া থাকে, যদি বাস্তবিক সেই বস্তুই কবুল হইয়া যায়, তাহা হইলে দুইটি অসুবিধার উৎপত্তি হয় ঃ - (১) হাজার হাজার বিনম্র প্রার্থনা, যাহা অতি অসহায় ও নিরুপায় অবস্থায় করা হইয়া থাকে, মঞ্জুর হয় না এবং

প্রার্থিত বিষয় পূর্ণ হয় না। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, সেই দোয়া কবুল করা হয় নাই। অথচ আল্লাহ্‌র ওয়াদা রহিয়াছে যে, দোয়া কবুল করা হইবে। (২) যে সব ঘটনা ঘটিবার এবং যে সব ঘটনা না ঘটিবার, তাহা পূর্ব হইতেই নির্ধারিত রহিয়াছে। ঐ সব পূর্ব-নির্ধারিত ঘটনা ধারার বিপরীত কিছু ঘটা সম্ভব নহে।

দোয়া মঞ্জুর হওয়ার অর্থ যদি প্রার্থিত ও আকাংখিত বস্তুকে পাওয়া বুঝায়, তাহা হইলে খোদাতাআলার প্রতিশ্রুতি ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ "আমার কাছে দোয়া কর, আমি নিশ্চয় উত্তর দিব" (৪০ঃ৬১), ঐ সব দোয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে তকদীরের লিখনে এইরূপ ঘটা নির্ধারিত নহে। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে দোয়া মঞ্জুরীর এই সাধারণ ওয়াদা বাতিল হইয়া যায়; কেননা, কেবল ঐ দোয়ার ঐ সকল অংশই কবুল হয়, যেগুলি কবুল হওয়া পূর্ব হইতেই নির্ধারিত ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে সাধারণভাবে, ঢালাওভাবে, কিনা ব্যতিক্রমে সব দোয়া কবুল করার। অথচ একদিকে আমরা কুরআনের এমন সব আয়াত পাই, যাহাতে বলা হইয়াছে, যাহা না ঘটিবার জন্য স্থিরীকৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহা কোন মতেই ঘটিবে না। অন্যদিকে, কতকগুলি আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, কোন দোয়াই প্রত্যাখ্যান করা হয় না, সব দোয়াই কবুল করা হয়। শুধু তাহাই নহে, বরং খোদাতাআলা সমস্ত প্রার্থনা কবুল করিবার ওয়াদা করিয়াছেন বলিয়াও সাব্যস্ত হয়। যেমন "আমার কাছে দোয়া কর, আমি কবুল করিব"। অতএব, এই আয়াতগুলিতে আমরা পরস্পর বিরোধিতা দেখিতে পাই। এই পরস্পর বিরোধিতা হইতে আমরা একটি উপায়েই নিস্তার পাইতে পারি। তাহা হইল এই যে, "দোয়াকে" "ইবাদত" অর্থে গ্রহণ করা। দোয়া কবুল করার অর্থ আল্লাহ্‌তাআলা ইহাকে নিছক ইবাদতরূপে গ্রহণ করিয়া লন অর্থাৎ দোয়া ইবাদত ছাড়া অন্য কিছু নহে। যদি এই দোয়ার কাজ অত্যন্ত নম্রতা, দীনতা, আত্মবিলীনতা ও অভিনিবেশ সহকারে নিবিষ্টচিত্তে সম্পন্ন করা হয়, তাহা হইলে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাহা ইবাদতরূপে গৃহীত হইবে এবং এই আরাধনা-উপাসনার জন্য আধ্যাত্মিক পুরস্কার লাভ হইবে। তবে, যাহা প্রাপ্তি ঘটিবে বলিয়া পূর্ব হইতে নির্ধারিত হইয়া রহিয়াছে, যদি উহাই ঘটনাচক্রে দোয়ার মধ্যেও চাওয়া হয়, তাহা হইলেই আক্ষরিকভাবে দোয়া কবুল হইয়া থাকে। ইহা দোয়ার ফলশ্রুতি নহে, বরং ইহা পূর্ব-নির্ধারিত থাকার কারণেই হইয়া থাকে। দোয়ার মধ্যে এই মঙ্গল আছে যে, দোয়া খোদার মাহাত্ম্য ও মহাশক্তি অনুধাবন করিতে সাহায্য করে। মনের এই ভাব-গম্ভীর প্রশান্ত অবস্থা সক্রিয় হইয়া স্বীয় অসহায়তা ও ব্যাকুলতার মনোভাবকে দূরীভূত করে এবং খোদা-নির্ভরতা, ধৈর্য ও কবুলিয়তের ভাব জাগাইয়া মনে প্রশান্তি আনয়ন করে। মনের এই প্রশান্ত অবস্থা

আসলে আরাধনারই ফল। আর এরই নাম "দোয়া কবুল" হওয়া। অতঃপর সৈয়দ সাহেব তাঁহার পুস্তিকায় বলেন, দোয়ার প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে যাহারা অজ্ঞ এবং যাহারা দোয়ার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সম্বন্ধে অনবহিত, তাহারা প্রশ্ন করিতে পারে– যাহা হইবার নহে বা যাহা না হওয়াই নির্ধারিত, তাহা যখন কোন মতেই হইবে না, তখন ইহা হইবার জন্য দোয়া করার ফায়দা কি? যাহা হওয়া মোকাদ্দর (নির্ধারিত) তাহা হইবেই এবং যাহা না হওয়া মোকাদ্দর তাহা হইবে না- হাজার বার বা তদুর্দ্ধবার দোয়া করিলেও হইবে না। অতএব, দোয়া করা অনর্থক কাজ নয় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে সৈয়দ সাহেব বলেন, অসহায় অবস্থায় সাহায্যের জন্য দোয়া করা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। সুতরাং মানুষ স্বভাবের তাগিদে দোয়া করে। বরং দোয়া বা দোয়া কবুল হইবে কি হইবে না, সে কথা না ভাবিয়াই মানুষ দোয়া করিতে থাকে। তাহার স্বভাবের বৈশিষ্ট্যগত চাহিদার কারণে তাহাকে শুধু খোদার নিকট প্রার্থনাকারীও বলা হইয়াছে।

সৈয়দ সাহেবের বক্তব্যের উপরোক্ত সারাংশ যাহা আমি বর্ণনা করিয়াছি উহা হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সৈয়দ সাহেবের মতে, প্রার্থনা বা দোয়া অভীষ্ট লাভের কোন কার্যকরী উপায় নহে; মকসুদ (উদ্দেশ্য) পুরা করণের ক্ষেত্রে দোয়ার কোন ভূমিকা ও প্রভাব নাই। যদি কোন দোয়াকারী দোয়ার মাধ্যমে কোন অভীষ্ট লক্ষ্য হাসিল করিতে চায়, তাহা হইলে সে অনর্থক এই দোয়া করে। কেননা, যাহা হইবার তাহাতো হইবেই এবং দোয়া ছাড়াই হইবে। আর যাহা হইবার নহে, তাহা বিনম্র ও নিবেদিত চিত্তে দোয়া করিলেও হইবার নহে। মোটকথা, সৈয়দ সাহেবের বক্তব্য হইতে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, দোয়া করা উপাসনার একটি পদ্ধতি মাত্র। দোয়া দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধির চিন্তা করা বা জগতে দোয়া দ্বারা কিছু লাভ করার কথা ভাবা অবান্তর–একান্তই অবান্তর।

প্রকাশ থাকে যে, সৈয়দ সাহেব কুরআন শরীফের যে সকল আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঐগুলির তাৎপর্য বুঝিতে তিনি ভুল করিয়াছেন। আমার প্রবন্ধের শেষাংশ আমি ইনশাআল্লাহ্, ঐ ভ্রমের অপনোদন করিব। এখানে আমি দুঃখের সহিত শুধু এইটুকুই বলিতে চাই যে, সৈয়দ সাহেব কুরআনের আয়াতের তাৎপর্য বুঝিতে না হয় ভুল করিতে পারেন, কিন্তু এই বিষয়ের সহিত "প্রকৃতির বিধান" যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই রচনা লিখার সময় সে কথা তিনি কি করিয়া ভুলিয়া গেলেন? তিনিতো এই প্রকৃতির বিধানের কথা অহরহ উচ্চারণ করেন। এমন কি তিনি ইহাও মনে করেন যে, প্রাকৃতিক বিধানের মাধ্যমেই আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কার্যতঃ জ্ঞাত হওয়া যায় এবং আল্লাহ্র পবিত্র কিতাবের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও নিগুঢ় তাৎপর্য অনুধাবন করিতে প্রাকৃতিক নিয়মাবলীকে তিনি সাক্ষ্যরূপে গণ্য করেন।

সৈয়দ সাহেব নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, যদিও এক অর্থে সুফল ও কুফলাদি পূর্ব হইতেই নির্ধারিত, তথাপি প্রকৃতিদত্ত উপায় ও উপকরণ দ্বারাই আমরা ঐ সুফল-কুফল পর্যন্ত পৌঁছিয়া থাকি। আর এই উপায়-উপকরণ ও প্রণালী-পদ্ধতি অবলম্বনের যথার্থতা সম্বন্ধে কোন বুদ্ধিমান লোক সন্দেহ পোষণ করেন না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'যাহা ঘটিবার তাহা তো ঘটিবেই" এই ধারণার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে যাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করা না করা আসলে যেমন আরোগ্যের জন্য দোয়া করা না করা-ঠিক তেমনি। এই বলিয়া কিঁ সৈয়দ সাহেব এই কথাও বলিবেন যে, ঔষধ-বিজ্ঞান মিথ্যা, সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ ঔষধের মধ্যে কোথাও গুণাবলী রাখেন নাই? সৈয়দ সাহেব "তকদীরে" বিশ্বাস করেন, তাহা সত্ত্বেও তিনি ঔষধের নিরাময়-ক্রিয়াও বিশ্বাস করেন। তাহা সত্ত্বেও আল্লাহ্তাআলার বিধানের এই দুইটি সদৃশ অংগের মধ্যে তিনি পার্থক্য করেন কেন? এই দুইটিই কি সমান্তরাল নহে? সৈয়দ সাহেব কি মনে করেন, যে আল্লাহ্তাআলা ট্রেপিথাম, স্কামোনিয়া, সিনা এবং ক্রোটন বীজে কোষ্ঠ পরিষ্কারের ক্ষমতা ও উপকরণ রাখিয়ছেন, আর্সেনিক, একোনাইট ও অন্যান্য বিষে এমন মরণোপকরণ রাখিয়াছেন যাহা অতিরিক্ত সেবনে কয়েক মিনিটেই মৃত্যু ঘটায়, সেই আল্লাহ্র কি শক্তি নাই যে, দোয়ার মধ্যেই আরোগ্যের উপকরণ রাখেন? ঐ সকল প্রিয় বান্দার দোয়ার মধ্যেও নহে, যাহারা তাঁহাকে আকুল ভরে আত্মহারা হইয়া ডাকেন, বিনম্রভাবে প্রণত হইয়া ডাকেন এবং অধ্যবসায়ের সহিত প্রাণ-পণ করিয়া ডাকিতেই থাকেন? এইসব লোকের দোয়াও কি প্রাণহীন, অর্থহীন কার্যকলাপই গণ্য হইবে? ঐশী নিয়ম পরস্পর বিরোধী নহে। ইহা কি করিয়া সম্ভব, সৃষ্ট জীবের উপকারার্থে খোদা ঔষধাদির মধ্যে উপকার সাধনকারী করুণাকর গুণাবলী রাখিয়াছেন, সেই খোদা ঐরূপ গুণাবলী দোয়ার মধ্যে রাখেন নাই? না, না, কখনই না, এইরূপ হইতেই পারে না।

আসল কথা হইল, সৈয়দ সাহেব দোয়ার আসল তত্ত্ব সম্যক ও সঠিকভাবে অবগত নহেন। দোয়ার অসাধ্য-সাধনকারী কার্যকারিতা সম্বন্ধে তাঁহার কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নাই। তাঁহার দৃষ্টান্ত এরূপ সময়োত্তীর্ণ একটি ঔষধের নমুনা, যাহা এক কালের আরোগ্যকারী শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে, এরূপ ঔষধ ব্যবহারকারী ব্যক্তির মতই তিনি ইহা অকার্যকারী পাইয়াছেন। এইরূপ ঔষধকে পাইয়া, তিনি ভাবিয়াছেন, ঔষধ মাত্রই অকার্যকারী। আফসোস্! শত আফসোস্! সৈয়দ সাহেব বার্ধক্যে পৌঁছিয়াছেন; কিন্তু বিশ্ব-বিধান কিভাবে কার্যকরী হইতেছে, তাহা অন্তর্দৃষ্টি দিয়া দেখেন না। এই ঐশী বিশ্ব-বিধান কত নিখুঁতভাবে

প্রতিষ্ঠিত। ইহার কার্যকরণ পরস্পর, পরস্পরের সাথে কি নিগুঢ় সত্যের বন্ধনে সম্বন্ধযুক্ত, সৈয়দ সাহেব তাহা জানেন না। এই কারণেই তিনি সহজে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে নিপতিত হইয়াছেন যে, প্রকৃতির বিধানের দ্বারা নিয়োজিত জাগতিক বা আধ্যাত্মিক উপায়-উপকরণ (কার্য-কারণ) ব্যতিরেকেই ফলোদয় হইয়া থাকে।

আমাদের জানা জগৎ "তকদীরে" ভরপুর। ইহার সব বস্তুরই অপরিবর্তনীয় মৌলিক গুণাবলী রহিয়াছে। আগুন, পানি, বায়ু, মাটি, চাল-ডাল-গম, গাছ-পালা, জীবজন্তু, ধাতবদ্রব্য, খনিজদ্রব্য, যাহা আমরা নিয়ত ব্যবহার করি, উহাদের নিজস্ব অপরিবর্তনীয় গুণাগুণের ভিত্তিতেই আমরা সেগুলি ব্যবহার করি। আর ঐগুলিকে ব্যবহার করিতে হইলে, ঐগুলি ব্যবহারের উপযোগী পন্থা ও উপায়-উপকরণ যাহা আল্লাহ্ ঠিক করিয়া দিয়াছেন, সেই উপায়-উপকরণ ও পন্থা অবলম্বন করি। উপায়-উপকরণকে বাদ দিবার চেষ্টা করা বোকামী বৈ আর কিছু নহে। দ্রব্যের নির্ধারিত গুণাবলী প্রাকৃতিক বিধানের অংগ। তেমনি ঐ গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত বাহ্যিক বা আত্মিক উপায়-উপকরণও প্রাকৃতিক বিধানেরই অঙ্গ। এই উপায় উপকরণের কার্যকারিতা অস্বীকার করা আর প্রাকৃতিক বিধানের অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তাকে অস্বীকার করা একই কথা। যাহা সৈয়দ সাহেব বলিতে চাহেন, তাহা এইরূপ ঃ সর্বত্রই উপায় অবলম্বন দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যবস্থা আছে। দোয়া অভীষ্ট লাভের কোন উপায় নহে। এই কথাটিই সৈয়দ সাহেবেরও রচনায় চূড়ান্ত রূপ লাভ করিয়াছে। তিনি আগুনের গুণাবলীকে অস্বীকার করেন না। তিনি একথার উপর নিশ্চয় জোর দিবেন না যে, যে ব্যক্তির অগ্নিদগ্ধ হওয়ার কথা তকদীরে আছে, সে কিনা আগুনেই অগ্নিদগ্ধ হইবে। দোয়া কি এই আগুনের মত কার্যকারিতাও রাখে না? খোদা কি দোয়ার মধ্যে এইটুকু গুণাগুণও রাখেন নাই? যখন সবদিক ঘিরিয়া কেবল অন্ধকারই দৃষ্টিগোচর হয়, দোয়াই কি আমাদিগকে রাস্তা প্রদর্শন করে না? বা আক্রমণোদ্যত হস্তকে দোয়াই কি অক্ষম করিয়া দেয় না? একজন মুসলমান হিসাবে তিনি তাহা কিরূপে অস্বীকার করিতে পারেন? তকদীরের নিয়মাবলী কেবল দোয়ার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা আর আগুনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করা, ঠিক নহে। কাযা-কদরের (তকদীরের) নিয়মাবলী উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য নয় কি? তকদীরের প্রতি সৈয়দ সাহেবের বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তিনি অন্যান্য ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পন্থা অবলম্বন করিতে দ্বিধা বোধ করেন না বরং সঠিক পন্থা অবলম্বনের তিনি এত বেশী পক্ষপাতি যে, এ ব্যাপারে তিনি কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইহা সত্ত্বেও তিনি দোয়াকে বাদ দিতেছেন কেন? প্রকৃতির যদি কোন বিধান থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে দোয়াও সেই বিধানেরই অঙ্গ। এই বিধানে অন্যান্য সবকিছু রাখিয়া কেবল

দোয়াকে বাদ দেওয়া যায় না। একটা মাছিরও কিছু শক্তি ও গুণাগুণ আছে অথচ দোয়ার মধ্যে কোনও শক্তি নাই? তাঁহার মতে দোয়া কিছুই করিতে পারে না? আসল কথা হইল সৈয়দ সাহেব জানেন না যে, দোয়া কি করিতে পারে, এ ব্যাপারে তাঁহার নিজের কোন অভিজ্ঞতাও নাই। এমন কি, দোয়া সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রাখেন, এইরূপ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত তাঁহার হয়ত উঠাবসাও হয় না। চলুন, এখন আমরা সর্বসাধারণের উপকারার্থে 'দোয়া-মঞ্জুরী' বলিতে কি বুঝায়, তাহা তলাইয়া দেখি। এই কথা স্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া দরকার যে, 'দোয়া-মঞ্জুরীর' ব্যাপারটি দোয়ার সামগ্রিক বিষয়টির একটা অঙ্গ মাত্র। অতএব, নিয়ম অনুযায়ী 'দোয়া' কি উহাই প্রথম বুঝা দরকার। তাহা না হইলে 'দোয়া-মঞ্জরী' কি তাহাও আমরা বুঝিতে পারিব না। কেবল অস্পষ্টতা ও ভুল-ভ্রান্তিই মাথা চাড়া দিবে এবং আমাদের বুঝিবার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিবে। আর সৈয়দ সাহেবের বেলায়ও ভুল বুঝার কারণ ইহাই।

দোয়া কি? আল্লাহ্ এবং তাঁহার সরল, নেক বান্দার মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ সুলভ ইতিবাচক সম্পর্কের অপর নাম দোয়া। আল্লাহ্র করুণা ও কল্যাণ বান্দাকে আল্লাহ্র দিকে আকর্ষণ করে। বান্দা যতই কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিকতার সাথে তাহাতে সাড়া দেয়, আল্লাহ্ ততই তাহার আরো নিকটে আসেন। দোয়ার মাধ্যমে এই সম্পর্ক এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় এবং এমন এক বিশিষ্ট গুণ ধারণ করে, যাহা আশ্চর্যজনক ফলাফল সৃষ্টি করে।

মনে করুন একজন লোক বড় বিপদে পড়িয়াছেন। তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস, পূর্ণ আশা, পরিপূর্ণ ভালবাসাপূর্ণ ভক্তি, আনুগত্য, সৎসাহস ও ভরসা সহকারে আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি এক অস্বাভাবিক অনুভূতি ও চৈতন্য লাভ করিবেন। তাহার উদাসীনতা ও মনভোলাভাব কাটিয়া যাইবে। অকর্মণ্যতা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার পর্দা ভেদ করিয়া তিনি আত্ম-বিলীনতার ময়দানে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকিবেন এবং পরিণামে নিজেকে আল্লাহ্র নিকটে পাইবেন। সেখানে আল্লাহ্র কাছে অন্য কোন ব্যক্তিকে বা অন্য কোন বস্তুকে দেখা যাইবে না। দেখা যাইবে কেবল আল্লাহ্কে। তাহার আত্মা আল্লাহ্র আস্তানায় প্রণত হইবে। যে আকর্ষণ শক্তি তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল, তাহাই আল্লাহ্তাআলার মধ্যেও শুভ প্রক্রিয়া সৃষ্টি করিবে। তিনি আল্লাহ্র করুণারাশিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে পারিবেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তখন ঐ ব্যক্তির প্রার্থিত বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিবেন। প্রার্থনার ফল সৃষ্টি করিতে শুরু করিবে। প্রথম ফল এই হইবে যে, অভীষ্ট হাসিলের জন্য যে যে উপায়-উপকরণ প্রয়োজন সেগুলি একত্র

হইতে লাগিল। যদি সৃষ্টির জন্য দোয়া করা হইয়া থাকে তাহা হইলে, দোয়া বৃষ্টির উপায়-উপকরণের সমাবেশ ঘটাইবে। দোয়ার কাজ, স্বাভাবিক উপায়গুলির সন্নিবেশ ঘটানো। দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির প্রার্থনা করা হইলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির জন্য যে সমুদয় সংশ্লিষ্ট অবস্থার প্রয়োজন সেই অবস্থাগুলির সমাবেশ করিবেন। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যাহারা ওয়াকিবহাল, যাহারা আধ্যাত্মিক সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহারা পুনঃ পুনঃ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানিয়াছেন যে, পূর্ণ-বিশ্বাসী ব্যক্তির কামেল দোয়াতে সৃজনীশক্তি দান করা হয়। আল্লাহ্র অনুমোদনক্রমে, তাহার দোয়া জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তখন বায়ু, অগ্নি, পানি, মাটি, আকাশ-মন্ডল, মানব-হৃদয় সবই প্রার্থিত আকাঙ্খার পথে পরিচালিত হয়। আল্লাহ্র পবিত্র কিতাবগুলিতে এইরূপ ঘটনাবলীর দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যে সকল ঘটনাকে আমরা 'মোজেযা' বলিয়া থাকি, সে সকল ঘটনার অধিকাংশই দোয়া-মঞ্জুরীর দৃষ্টান্ত। নবীগণের ও ওলী-আল্লাহ্গণের হাজার হাজার মোজেযা যাহা পৃথিবীর আরম্ভ অবধি আজ পর্যন্ত দেখা গিয়াছে, সেগুলির উৎস হইল দোয়া। দোয়া সর্বশক্তিমান, মহাপ্রতাপান্বিত, আল্লাহ্তাআলার সার্বভৌম ক্ষমতাকে প্রকাশ করিয়া দেখায়, আর মোজেযাগুলি উহারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আরবের মরু প্রান্তরে কী ঘটিয়াছিল? ঘটিয়াছিল আশ্চর্য বিপ্লব! ঘটিয়াছিল আশ্চর্যকে ছাড়াইয়া অত্যাশ্চর্য বিপ্লব। একটি জাতি সংখ্যায় কয়েক লক্ষ হইবে-যাহারা নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে মৃত ছিল-অল্পদিনের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে মহা বলিয়ান হইয়া উঠিল। যাহারা বংশ পরাম্পরায় দুর্নীতিপরায়ণ ও কলুষিত হৃদয় ছিল, তাহারা পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হইয়া গেল। অন্ধ দেখিতে লাগিল। যাহারা বোবা ছিল, তাহারা পৃথিবীর বুকে ঐশী সত্যকে প্রচার করিতে লাগিল। এমন এক মহা বিপ্লব সংঘটিত হইল, যাহা পূর্বে আর কখনও দেখা যায় নাই, এমনকি শোনাও যায় না। ইহা কিভাবে হইল, জানেন কি? কেবল দোয়ার বলে। হ্যাঁ, কেবল দোয়ার বলে। এক ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্র খাতিরে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারই দোয়ার বলে। দোয়াতো তিনি দিবানিশিই করিতেন। কিন্তু তিনি নিঝুম নিস্তব্ধ গভীর নিশীথে প্রাণপাত করিয়া যে দোয়া করিতেন, বিশেষভাবে সেই দোয়ার ফলেই ঘটিয়াছিল এই অলৌকিক মহা-বিপ্লব। এমন মহা পরিবর্তন আসিল, যাহা এই নিঃসঙ্গ ও নিরক্ষর ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত বলিয়া ধারণাই করা যায় না। যে কেহ এই পরিবর্তন সাধনকে অসম্ভব মনে করিতে বাধ্য। তথাপি তাহা ঘটিল। হে

আল্লাহ্, তাঁহার আত্মাকে আশীর্বাদ কর। তাঁহার প্রতি শান্তি বর্ষণ কর। তাঁহার প্রতি ও তাঁহার উম্মতের প্রতি এত বেশী বেশী পরিমাণ আশিস বর্ষণ কর, যত বেশী বেশী পরিমাণ ছিল তাঁহার উম্মতের জন্য তাঁহার উদ্বেগ-ভালোবাসা ও তাঁহার চিন্তা, আর যত বেশী পরিমাণে ছিল উম্মতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার ভয়। হে প্রভু, কেয়ামত পর্যন্ত তাঁহার উপর তোমার বরকত ও অনুগ্রহরাজি অবিরাম বর্ষণ করিতে থাকো।

আমার নিজের অভিজ্ঞতায় আমি দেখিয়াছি যে, আগুন বা পানি হইতেও দোয়া অধিকতর দ্রুততা ও শক্তির সহিত কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে, প্রকৃতি যত উপায়-উপকরণ যোগাইয়াছে, উহার মধ্যে সবচাইতে অধিক শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ হইল দোয়া। দোয়ার মত কার্যকরী অন্য কিছু নাই।

যদি এই কথা বলা হয় যে, দোয়া তো বিফলও হয়; অকার্যকর এবং অফলপ্রসূও হইয়া থাকে। সেই ক্ষেত্রে আমার জওয়াব হইল, ঔষধের বেলায়ও তো এই রকম হয়। ঔষধাদি কি মৃত্যুর দুয়ার বন্ধ করিতে পারিয়াছে? ইহা অসম্ভব নহে যে, ঔষধে অনেক সময় ক্রিয়া করে না। তাহা সত্ত্বেও ঔষধের ক্রিয়াশক্তির এবং গুণাগুণকে কেহই অস্বীকার করিবেন না। ইহা সত্য যে, প্রত্যেক বস্তুর ক্ষেত্রেই এবং প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রেই তকদীর সক্রিয় আছে। সবকিছুই তক্‌দীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। কিন্তু তক্‌দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অকেজো ও অপ্রয়োজনীয় করিয়া দেয় নাই। এবং উপায়-পদ্ধতিকে অবিশ্বাসের বস্তুতে পরিণত করে নাই। আরেকটু গভীরে তলাইয়া দেখিলে, আপনি দেখিতে পাইবেন, জাগতিক উপায়-উপকরণ ও আধ্যাত্মিক উপায়-উপকরণ এতদুভয়ই সমানভাবে তকদীরের অধীন অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিমাপ ও বিধি-বিধানের অধীন। যদি কোন ব্যক্তি রুগ্ন হয় এবং বিধি-বিধানে নিরাময় হওয়া নির্ধারিত থাকে, তাহা হইলে সুস্থ হইবার সকল শর্তাবলী পূর্ণমাত্রায় আসিয়া মওজুদ হইবে। তাহার শরীরের প্রতিক্রিয়া-শক্তিও এই শর্তাবলীর অন্তর্গত। এই ক্ষেত্রে ঔষধ আশ্চর্যভাবে কাজ করে এবং লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হয়। তেমনিভাবে দোয়াও। আল্লাহ্ সেখানে দোয়া কবুল করার ইচ্ছা রাখেন সেখানে কবুল হওয়ার প্রয়োজনীয় অবস্থাগুলিরও একত্র সমাবেশ ঘটে। জড় জগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ একইভাবে কার্যকারণ পরম্পরা বিধানের অধীন। সৈয়দ সাহেবের ভুল এইখানেই যে, তিনি জাগতিক বিধানে কার্যকারণ পরম্পরা মানেন কিন্তু আধ্যাত্মিক বিধানে তাহা অস্বীকার করেন।

পরিশেষে আমি বলিতে চাই, সৈয়দ সাহেব যদি তার ভুল মতামত প্রত্যাহার না করেন, তিনি যদি দোয়া ফলপ্রসূ হওয়ার প্রমাণ তলব করিতে থাকেন, তাহা হইলে প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিরূপে আমার ঐশী-প্রদত্ত দায়িত্ব যে, তাঁহার এই ভুল ধারণা আমি দূর করি। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি কতগুলি দোয়া করিয়া ঐগুলি কবুল হইবে বলিয়া পূর্বাহ্নেই সৈয়দ সাহেবকে জানাইয়া দিব। শুধু তাঁহাকে জানাইয়াই ক্ষান্ত হইব না, বরং তাহা আগে ভাগে সংবাদরূপে ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়া দিব। সৈয়দ সাহেবকেও প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, আমার দোয়া কবুল হইয়াছে দেখার পর তিনি তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিয়া নিবেন, এবং ভুল চিন্তাধারা পরিত্যাগ করতঃ সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

আমার মনে হয় সৈয়দ সাহেব ভাবিয়াছেন যে, কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তাআলা সব দোয়াই কবুল করার ওয়াদা করিয়াছেন। কিন্তু সব দোয়াতো কবুল হয় না। এইখানেই তিনি বড় ভুল করিয়াছেন। তিনি নিম্নলিখিত আয়াতের উপর নির্ভর করিয়াছেন ঃ اُدْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (৪০-৬১) "আমার কাছে প্রার্থনা কর, আমি তোমাদিগকে জওয়াব দিব।" এই আয়াত তাঁহাকে সাহায্য করে না। কারণ এখানে "প্রার্থনা করার আদেশ আছে।" যে প্রার্থনার জন্য আদেশ দেওয়া হয়, তাহা সাধারণ দোয়া হইতে পারে না। আদিষ্ট প্রার্থনা অবশ্য-করণীয় (ফরয) প্রার্থনা। "আমার কাছে প্রার্থনা কর" এই নির্দেশের মধ্যেই বুঝা যায়, এই প্রার্থনা অবশ্য-পালনীয় উপাসনার অন্তর্গত। আর ইহা জানা কথা যে, সব দোয়া বা প্রার্থনা অবশ্য-করণীয় (ফরয নহে)। এমন কি সব সময় দোয়া করা ঠিকও নহে। এইজন্যই আল্লাহ্‌তাআলা স্থানে স্থানে ঐসব লোকের প্রশংসা করিয়াছেন, যাহারা দুর্ভাগ্যকে বরণ করিয়া লন এবং ধৈর্য ধারণ করেন। তাহারা সুখী ও তুষ্ট। এই কথা বলিয়াই তাহারা সান্ত্বনা পান যে, আমরা আল্লাহ্‌র জন্যই। প্রকৃতপক্ষে এই আয়াতের নির্দেশ 'উপাসনারই' নির্দেশ। এইকথা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে, যখন আমরা দেখি যে, একই আয়াতে এই নির্দেশের পরবর্তী বাক্যেই ইবাদত সম্পর্কিত বিষয়াদি উত্থাপিত হইয়াছে যাহা যথাযথভাবে পালন না করিলে শাস্তি -স্বরূপ জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ

(যাহারা গর্বের কারণে আমার উপাসনা করে না, তাহারা দোযখের আগুনে প্রবেশ করিবে ৪০-৬১)। নফল সাধারণ দোয়া না করার সহিত এরূপ ভীতি প্রদর্শন জড়িত থাকে না। বরং অনেক সময় নবীগণকে অতিরিক্ত দোয়া করার জন্য স্নেহ-জড়িত মৃদু ভর্ৎসনা করা হইয়াছে। যেমন -

إِنِّيٓ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجٰهِلِينَ۝

"আমি তোমাকে বারণ করিতেছি, নতুবা তুমি জাহেলদের অন্তর্গত হইবে" (১১ঃ৪৭)। ইহা হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক প্রার্থনাই যদি উপাসনা হইত, তাহা হইলে আল্লাহ্ কোন ক্ষেত্রেই প্রার্থনা করা বারণ করিতেন না। হযরত নূহ (আঃ)-কে বলা হইল, فَلَا تَسْـَٔلْنِ "আমার কাছে (এখনই) কিছু চাহিও না" (১১ঃ৪৭)। এখানে মানা করা হইল কেন? ইহাও দেখা যায় যে, কোন কোন বিষয়ে খোদার কাছে প্রার্থনা করিতে ওলী-আল্লাহ্ ও নবীগণ নিজেদের জন্য আদবের খেলাফ মনে করিতেন। ধার্মিক নিজেদের মনের গভীরে তাকাইয়া দেখেন ও বিবেকের হেদায়াত গ্রহণ করেন এবং বিবেকের ডাকে সাড়া দিয়া কাজ করিয়া থাকেন। বিপদের সময়ে, তাহাদের বিবেক যদি দোয়া করিতে বলে, তাহারা দোয়া করেন। আর যদি তাহাদের বিবেক ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়,তাহা হইলে দোয়া না করিয়া, তাহারা ধৈর্য ধারণ করেন। তখন তাহারা প্রার্থনা বা দোয়ার কথা ভাবেনও না। এইরূপ সাধারণ দোয়া বা প্রার্থনার ফলাফল মহামহিম আল্লাহ্র ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধীন হইয়া থাকে। মঞ্জুর করা না করা সম্পূর্ণ তাঁহার এখতিয়ারে। ইহার প্রমাণ আছে এই আয়াতে ঃ

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَآءَ অর্থাৎ - "তোমরা শুধু তাঁহারই কাছে দোয়া করিবে এবং যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনিই তোমার অবাঞ্ছিত বস্তু, যাহা দূর করিবার জন্য তুমি দোয়া করিবে, তাহা সরাইয়া দিবেন" (৬ঃ৪২)। 'যদি তিনি ইচ্ছা করেন' কথাটি প্রণিধান করুন, দেখিবেন, দোয়া কবুল হইবেই এখানে এইরূপ নিশ্চয়তা দেওয়া হয় নাই।

তর্কের খাতিরে যদি আমরা ধরিয়াও লই, اُدْعُوْنِيْٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ শব্দ দ্বারা এইখানে সাধারণ পর্যায়ে দোয়ার কথা বলা হইয়াছে তথাপি একথা স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য যে, গ্রহণযোগ্যতার শর্তসমূহ সমাবেশ-সহকারে এই দোয়া করার কথা বলা হইয়াছে। ইহার অন্য অর্থ হইতে পারে না। আর গ্রহণযোগ্যতার সকল শর্ত পূরণ করা মানুষের এখতিয়ারে নহে। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সাহায্য ছাড়া ইহা সম্ভব নহে। মনে রাখা দরকার, বিনয় ও কাতরতাই একমাত্র শর্ত নহে। অন্যান্য বহু শর্ত রহিয়াছে যেমন- ধর্ম-ভীরুতা, পবিত্রতা, সত্যবাদিতা, সংশয়াতীত অটল বিশ্বাস, খোদা-প্রেম, একাগ্রচিত্ততা ও গভীর অভিনিবেশ ইত্যাদি। আর সব কিছুর উপরে বিবেচ্য, যাহা চাওয়া হইল, উহার পরিণাম আল্লাহ্র জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে, দোয়াকারীর জন্য বা যাহার স্বপক্ষে দোয়া করা হইল তাহার জন্য, ইহকালে ও পরকালে মঙ্গলজনক কি না। কারণ অনেক সময় এমনও হয় যে, মহা প্রয়োজনীয় এই শর্তটি বাদে অন্য সব শর্তই পূরণ হইল- কিন্তু প্রার্থিত বস্তু-খোদার দৃষ্টিতে শুভ বা কল্যাণকর নহে। কবুলিয়তের জন্য এই শর্তটিও পূর্ণ হওয়া আবশ্যক।

একটি আদরের শিশু জ্বলন্ত অঙ্গার কিংবা একটি ছোট সাপ লইয়া খেলিবার জন্য যত চিৎকারই করুক না কেন, আর যত কাকুতি মিনতিই করুক না কেন অথবা সুবর্ণ বিষ পান করিবার জন্য জিদই করুক না কেন, মা কি তাহা করিতে দিবে? কখনই না, বাচ্চার কাছে এইগুলি যত আকর্ষণীয়ই হউক না কেন। মনে করুন, মা যদি এরূপ করিয়াই বসে, আর শারীরিক কোন ক্ষতি নিয়া বাচ্চা বাঁচিয়া যায়, তাহা হইলে সেই শিশু বড় হইয়া মায়ের এই বোকামীর জন্য মায়ের বিরুদ্ধে অনুযোগ করিতে থাকিবে। যাহা হউক, দোয়াকে সত্যিকারের দোয়ায় রূপান্তরিত করার জন্য আরও কতগুলি শর্ত পূরণ হওয়া প্রয়োজন যাহার সাথে আধ্যাত্মিক শক্তি সংযোজিত হওয়া বিশেষভাবে আবশ্যক। এই সমস্ত শর্ত দোয়ার পূর্বশর্ত, যাহা পূরণ না করিলে, দোয়া সত্যিকারের অর্থে দোয়া হয় না। যিনি দোয়া করেন ও যাহার জন্য দোয়া করা হয় তাহাদের উভয়েরই কতকটা ব্যক্তিগত যোগ্যতা থাকাও দরকার, যাহা দোয়াকে গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলে। যে পর্যন্ত সেই উপযুক্ততা অর্জিত না হয়, সে পর্যন্ত দোয়া কবুল হওয়ার আশা করা যায় না। আর, এই সব কিছুরই উপরে রহিয়াছে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা দোয়া-মঞ্জুরীর স্বপক্ষে না হইলে, শর্তসমূহের একত্র সমাবেশও ঘটিবে না। এমনও হয় যে, যাহারা দোয়া করেন, তাহারা নিজেরাই দোয়ার বিষয়ে ইচ্ছা ও সংকল্পে অটল থাকিতে ব্যর্থ হন।

সৈয়দ সাহেব এই বিষয়ে একমত যে, পরকালের পুরস্কার, যথা ঃ কল্যাণ, আনন্দ, সুখ-ভোগ ও স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি যাহার সমষ্টিকে আমরা এক কথায় 'পরিত্রাণ' নামে অভিহিত করি, তাহা ঈমানের এবং ঈমান-দীপ্ত প্রার্থনারই ফল। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি আরেকটু অগ্রসর হইলেই স্বীকার করিতে পারিতেন যে, একজন সত্যনিষ্ঠ বিশ্বাসীর দোয়া নিশ্চয় উদ্দেশ্য সাধনে সম্পূর্ণ সক্ষম। বিপদাপদ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিয়া, আশা-আকাঙ্খার পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভই প্রকৃত পক্ষে পরিত্রাণ। দোয়া যদি ইহকালে কার্যসিদ্ধি লাভে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে কিয়ামতের দিনে ইহা সফল ও কার্যকরী হইবে কিভাবে? ইহা ভাবিয়া দেখিবার দাবী রাখে। দোয়া যদি ইহজগতে কার্যকরী হাতিয়াররূপে, উদ্দেশ্য সাধনের উপায়রূপে কাজ না করে, ইহকালের বিপদাপদ ও দুর্বিপাকসমূহ নিরসনে যদি ইহা ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে বিচার দিনে ইহা কাজে আসিবে, তাহা কি করিয়া ভাবা যায়?

অতএব, ইহা সুস্পষ্ট যে, দোয়ার বরকতে যদি বিপদ-আপদ সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে ইহার কার্যকারিতা ইহজীবনেই সফলভাবে দৃষ্টিগোচর হইবে। ইহাতে আমাদের ঈমান ও ভরসা বৃদ্ধি পাইবে, আমাদের ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্খা উদ্দীপ্ত হইবে এবং পরকালে পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করার ব্যাপারে এক নতুন প্রেরণা, নতুন অনুভূতি, নতুন উদ্যম ও নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হইবে।

সৈয়দ সাহেব যেভাবে বলেন যে, ইহকালে দোয়া কার্যকরী হয় না, বা দোয়া দ্বারা কোনও লাভ হয় না বরং যাহা পূর্ব-নির্ধারিত আছে, ইহজগতে কেবল তাহাই ঘটিবে, তাহা হইলে পরকালের মঙ্গলের জন্য দোয়া করাও নিষ্ফল ও অকার্যকরীই থাকিবে। কোনও ফলোদয় ঘটাইতে পারিবে না। এমতাবস্থায়, পরকালে পরিত্রাণ লাভের জন্য দোয়া করাও হইবে সমানভাবে নিরর্থক।

এই রচনার এখানেই ইতি টানি। পাঠকবৃন্দের মাঝে যাহারা ন্যায়পরায়ণ ও বিবেকবান, তাহারা আমার বক্তব্য ও যুক্তি হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, সৈয়দ সাহেব দোয়ার বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া ভুল পথে চলিয়া গিয়াছেন। ইহার পরও যদি তিনি তাঁহার মতামতের উপর অটল থাকিতে চান, তাহা হইলে অন্য পন্থায় বিষয়টা মীমাংসা করার প্রস্তাব আমি উপরে পেশ করিয়াছি। তিনি তাহাও গ্রহণ করিতে পারেন। অবশ্য যদি তিনি সত্যি সত্যিই সত্যান্বেষী হন, তাহা হইলে এই পন্থায় মীমাংসায় পৌঁছাইতে তিনি আপত্তি করিবেন না।

ঃ কুরআনের তফসীর ও উহার নীতিমালা ঃ

সৈয়দ সাহেবের দ্বিতীয় পুস্তক 'তাহরীর ফি উসূলিত্ তফসীর' (তফসীরের নীতিমালা), তাঁহার পুস্তক 'দোয়া ওয়াল ইস্তিজাবাহ্' (দোয়া ও উহার কবুলিয়ত)-এর একদম বিপরীত। এতই বিপরীত যে, মনে হয় যেন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পুস্তিকা দুইটি লিখিয়াছেন।

'কবুলিয়তে দোয়া' সম্বন্ধীয় রচনায় তিনি 'তকদীরের' উপর ভিত্তি রাখিয়াছেন। কার্য-সিদ্ধির জন্য উপায়-উপকরণ যে কাজে আসে, তাহাও তিনি এই ক্ষেত্রে মানিতে নারাজ। উপকরণকে অগ্রাহ্য করার কারণেই, দোয়া কবুল হওয়াকেও তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। দোয়া উদ্দেশ্য সাধনের বিশিষ্ট উপায়, ইহার কার্যকারিতা লক্ষাধিক নারী ও কোটি কোটি ওলী আল্লাহ্*স্বীয় অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছেন। নবীগণ যে মহা অস্ত্র ধারণ করিয়া সহস্র প্রকারের বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করিয়াছেন, তাহা দোয়া ছাড়া অন্য কিছু ছিল কি? এতদ্সত্ত্বেও সৈয়দ সাহেব তাহা অস্বীকার করেন। কেননা, দোয়ার ক্ষেত্রে তিনি 'তকদীরকে' সমূহ প্রাধান্য দিয়াছেন।

---

* মহান ওলী-শিক্ষক ও মোরশেদ সৈয়দ আব্দুল কাদির জিলানী (আল্লাহ্ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হউন) পূর্ণ মানবের আধ্যাত্মিক গুণাবলীর প্রভাব এবং তাঁহার দোয়া কিভাবে কবুল হয়, সেই বিষয়ে 'ফতুহুল গায়েব' নামক তাঁহার রচিত পুস্তকে স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে আলোচনা করিয়াছেন। পাঠকের উপকার ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে সেই কিতাবের একটি পরিচ্ছদ উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে করি। নিম্নে মূল আরবী ভাষায় তরজমাসহ পরিচ্ছদটি দেওয়া হইল। তাঁহার বক্তব্যের সারাংশ হইল এই যে, প্রত্যেক বিষয়েই সুদক্ষ ব্যক্তিগণের অভিমত অদক্ষগণের অভিমত হইতে অধিকতর নির্ভরযোগ্য। এই কারণে, দোয়া মঞ্জুরীর ব্যাপারে সেই ব্যক্তিরই মতামত প্রকাশের

কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় রচনা 'তফসীরের নীতিমালা ও মানদন্ড' লিখিতে গিয়া তিনি বিধিলিপির (তকদীরের) কথা একেবারে বিসর্জন দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কেননা, এই পৃথিবীর বস্তুগুলিকে তিনি একরকম 'স্বয়ং-সত্তার' স্থান দান করিয়াছেন বলিয়া প্রতীতি জন্মে। তিনি মনে করেন, বস্তু নিচয় খোদার কর্তৃত্বের

অধিকার বেশী, যিনি মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সহিত প্রগাঢ় প্রেম ও আনুগত্যের সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন। অতএব, সৈয়দ আহমদ খান সাহেব হইতে দোয়ার পবিত্র দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান অনুসন্ধান করা, আর হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে রোগের চিকিৎসা জিজ্ঞাসা করা সমান কথা। তিনি সরকার ও তাঁহার প্রজাবৃন্দের মধ্যে যে সমস্যা আছে, সেইগুলির ব্যাপারে নিপুন ও দক্ষ। কিন্তু যেখানে মানুষ ও খোদার পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপার, সেখানে খোদাপ্রাপ্ত লোকদের কাছে যাওয়াই সর্বোত্তম। বড় পীর হযরত সৈয়দ আবদুল কাদির জিলানী (রাঃ)-এর পুস্তক হইতে উদ্ধৃতিটি এই ঃ

فاجعل أن جملتك واجزاءك اصناما مع سائر الخلق ولا تطع شيئا من ذلك ولا
تتبعه جملة فتكون كبريتا احمر فلا تكاد ترى فحينئذ تكون وارث كل نبي ورسول
وبك تختم الولاية وتنكشف الكروب وبك تسقى الغيوث وبك تنبت الزروع
وبك تدفع البلايا والمحن عن الخاص والعام واهل الثغور وتقليبك يد الفلك ويسوك
نشطت الازل وتنزل منازل من سلف من اولى العلم ويرد عليك التكوين وخرق العادات .
وتومر على الاسرار والعلوم اللدنية وغرائبها ـ

অনুবাদ ঃ আপনি আল্লাহ্‌র প্রিয় হইতে চান? তাহা হইলে নিশ্চিতভাবে জানিয়া রাখুন যে, আপনার হাত, পা, জিহ্বা, চক্ষু, আপনার সারা দেহ ও সত্তা এবং ইহার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মূর্তি বিশেষ, বাধা স্বরূপ পথ রোধ করিয়া রাখে। অন্যান্য বস্তুও এই রাস্তার প্রতিবন্ধক হয় যেমন আপনার পুত্র-কন্যা, আপনার স্ত্রী, যা কিছুই আপনি প্রিয় মনে করেন, ধন-সম্পদ জাগতিক মান-সম্মান, নাম-ধাম ও প্রসিদ্ধি, দুনিয়ার ভীতি, দুনিয়ার সম্পর্কাদি ও উপায়-উপকরণের প্রতি গুরুত্বারোপ আপনার বন্ধু যায়েদ বা বকর যাহাদের উপর আপনি বিশ্বাস রাখিতে পারেন, আপনার শত্রু খালেদ বা ওলীদ যাহাদিগকে আপনি ভয় করেন, তাহারাও আপনার উপাস্যস্বরূপ। এই পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী। এই মূর্তিগুলির প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিবেন না। এইগুলির কোনটাকেই অতিরিক্ত মূল্য দিবেন না। এইগুলির কোন কিছু লইয়া লিপ্ত থাকিবেন না। শরীয়াতের বিধান এইগুলির যে স্থান নির্ধারণ করিয়াছে ও দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছে এবং ধার্মিক লোকদের আচরণে যেইরূপ দেখা গিয়াছে, ততটুকু স্থানই উহাদের দান করুন। এর বেশী নহে। যদি আপনি তাহাই করেন, তাহা হইলেই আপনি প্রবাদ বাক্যের 'লাল-গন্ধকে' (পরশ-পাথরে) পরিণত হইবেন (অর্থাৎ অতি সাধারণ বস্তুকে মহা মূল্যবান বস্তুতে পরিণত করিতে সক্ষম হইবেন)। আপনার মোকাম অতি উচ্চ মোকাম হইবে; এত উচ্চ যে, আপনাকে দেখাই যাইবে না অর্থাৎ অন্যেরা সহজে আপনাকে বুঝিতে পারিবে না; আল্লাহ্‌ তখন আপনাকে নবীগণের ও ঐশী দূতগণের মেধা প্রদান করিবেন। হারানো জ্ঞান, বিলুপ্ত অভিজ্ঞান

বাহিরে থাকিয়া আপন অধিকার বলেই অস্তিত্ববান হইয়াছে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত তাহাদের পরিবর্তন বা রূপান্তর হয় না। সৈয়দ সাহেবের আল্লাহ্‌ যেন সীমিত পর্যায়ের আল্লাহ্‌। পূর্বে হয়ত বাধা দান ও হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা তাঁহার ছিল, কিন্তু এখন আর নাই। বস্তুনিচয়ের গুণাগুণ, যাহার যে গুণ আছে বলিয়া আমরা জানি, তাহা এখন আর খোদা কর্তৃক নির্ধারিত হয় না। এই বস্তুর গুণগুলি বস্তুর নিজস্ব; ইহার পরিবর্তন, রূপান্তর বা পরিবর্দ্ধন আর সম্ভব নহে। কেননা তক্‌দীর মানিতে গেলে, একজন মোকাদ্দিরের (নিয়ন্তার) উপস্থিতিও চুপিসারে মানিতে হয়, যিনি গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু বস্তুর গুণাগুণ যদি খোদা-নির্ভর না থাকিয়া স্বনির্ভর হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা বলা যায় যে, এখন খোদা বস্তু-গুণাগুণ আর নির্দ্ধারণ করেন না, এইগুলির দেখা শুনাও তিনি আর করেন না, এইগুলির উপর এখন আর তাঁহার কর্তৃত্ব নাই। আর যদি বস্তু-গুণাগুণ তাঁহার আয়ত্তে থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে, সেইগুলির পরিবর্তন ও রূপান্তর তাঁহার ইচ্ছামত হইতে বাধ্য। মোট কথা, তাহার দ্বিতীয় পুস্তিকায় **সত্যিকার চূড়ান্ত নির্দ্ধারক (আল্লাহ্‌)** বস্তু-নিচয়ের উপর আপন প্রভুত্ব ও নিয়ন্ত্রণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। বস্তু-নিচয় এখন আর ঐশী প্রভুর ইচ্ছাধীন নয়। ইহা যেন এংলো ইন্ডিয়ান আইনের বংশ পরম্পরা প্রজাস্বত্বের (৫নং ধারার) মত। সেই ধারা মতে প্রজাগণের উপর জমিদারের কোন কর্তৃত্ব বা অধিকার নাই। এই বংশগত প্রজাসাধারণের ন্যায়, পৃথিবীর বস্তুগুলি (যেমন আগুন ইত্যাদি) তাহাদের নিজ

ও আশীর্বাদসমূহ, যাহা নবীগণের পরিত্যক্ত সম্পত্তি, আপনি পুনরায় সেইগুলি প্রাপ্ত হইবেন। আপনি বেলায়াতের চরম শিখরে উঠিতে পারিবেন। ভবিষ্যতে আপনার উপরে অন্য কোন ওলী উঠিতে পারিবে না। আপনার দোয়া, আপনার সংকল্প, আপনার পবিত্র স্পর্শ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা অবসান ঘটাইতে পারিবে। যাহারা খরা, দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়াছে, আপনার দোয়ায় তাহারা বৃষ্টির পানি লাভ করিবে। শুষ্ক মাঠগুলি শস্য-শ্যামল হইয়া উঠিবে। সর্ব সাধারণের দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা এমনকি বাদশাহ্‌গণের গুরুতর সমস্যাবলী আপনার দোয়ার বরকতে আপনাআপনি মিলাইয়া যাইবে। ঐশী শক্তির দৃঢ় হস্ত আপনার সাথে সদা বিরাজিত থাকিবে। ইহা যে দিকে যায়, আপনিও সেই দিকে যাইবেন। চিরস্থায়ী বাণী - খোদার বাণী আপনাকে পরিচালিত করিবে। যাহা বলিবেন তাহাই খোদার বাণীস্বরূপ হইবে এবং উহাই আশীষ-মন্ডিত হইবে। আপনার পূর্বে যে সকল ধার্মিক লোক ঐশী জ্ঞানে আলোকিত ছিলেন, আপনি তাঁহাদের সঙ্গে বলিবেন। ঐশী নিয়ন কানুনেও আপনার হাত কাজ করিবে। আপনার দোয়া ও আপনার ইচ্ছা মহাজগতেও পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবে। তারপর, যাহা আছে তাহা আপনি লয় করিতে চান বা যাহা নাই তাহা আপনি সৃষ্টি করিতে চান, এই সবই আপনি চাহিলে করিতে পারিবেন। আপনার হাতে অলৌকিক ঘটনাবলী ঘটিবে। আপনাকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ভূষিত করা হইবে। ঐশী গোপন বিষয়াদির তত্ত্বজ্ঞান আপনাকে প্রদান করা হইবে। এই সবই হইবে আল্লাহ্‌র দান। এই পুস্তকারাদি ও অনুগ্রহরাজি প্রাপ্তির যোগ্যতা আপনি- অর্জন করিবেন, আর এইগুলির জন্য আপনি হইবেন আমানতদার।

নিজ সীমানায় স্বয়ং প্রভু। বরং উহার চাইতেও বেশী। কেননা, এংলো ইন্ডিয়ান আইনে এক শর্তে প্রজাকে উচ্ছেদ করা যায়। এক বৎসরের খাজনা বাকী থাকলে খাজনার পরিমাণ যত অল্পই হউক না কেন, প্রজাকে উচ্ছেদ বরা যায়। সৈয়দ সাহেবের মতে জমিদারের এই অধিকার টুকুও শেষ হইয়া গিয়াছে। আর ইহা নিষ্ঠুর, কতই না নিষ্ঠুর!

সৈয়দ সাহেব তাহার প্রতিপক্ষকে 'তফসীরের' (কুরআনের ব্যাখ্যার) ব্যাপারে তর্কযুদ্ধ আহ্বান করিয়াছেন। অর্থাৎ কুরআনের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বর্ণনার নীতিমালা ও ভিত্তি নির্ণয়ক বিষয়াদি নিয়া তর্কের আহ্বান জানাইয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হইল, এই কাজটা স্বেচ্ছায়ই আমার করা উচিত। কেননা, পথ হারানো একজন পথিককে রাস্তা দেখানোর দায়িত্ব বর্তাইয়াছে অন্যদের চাইতে আমার উপর বেশী।

আমার মতে তফসীরের মূল নীতিগুলি এইঃ তফসীরের প্রথম নীতি-নির্দ্ধারক হইল কুরআন করীম স্বয়ং নিজেই। কুরআনের যে কোন একটি আয়াতের অর্থ কুরআনেরই অন্যান্য আয়াতের মাঝে পাওয়া যায়। এই কথাটা অতি সাবধানতার সহিত স্মরণ রাখা দরকার যে, পবিত্র কুরআন অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মত নহে। কুরআনের বর্ণিত কোন উক্তির সত্যতার সাক্ষ্যের জন্য এবং ইহার সঠিক অর্থ প্রকাশের জন্য অন্যান্য পুস্তকের উপর নির্ভর না করিয়া কুরআন নিজের উপরই নির্ভর করে। ইহার একাংশের অর্থ বিকৃত করিলে, সমস্ত কুরআনের অর্থেই বিকৃতি আসিবে। কুরআন একটি পূর্ণ সামঞ্জস্যময় অট্টালিকা। ইহার প্রতিটি ইট সঠিক স্থানে গাঁথা আছে। একটা ইটকে স্থানান্তরিত করিলে, সমস্ত অট্টালিকাই সামঞ্জস্য হারাইয়া ফেলিবে। এমন কোন উক্তি নাই, যাহার সাহায্যকল্পে কুরআনের আরও ১০/২০টি স্থানে অনুরূপ উক্তি বিদ্যমান নাই। কুরআনের কোন আয়াতের যদি একটা অর্থ করা হয়, তাহা হইলে আমাদের দেখা উচিত, কুরআনে অন্য কোন স্থানে সমার্থবোধক আরো আয়াত পাওয়া যায় কি-না। সমার্থবোধক 'পাঠ' না পাওয়া গেলে কিংবা তৎপরিবর্তে বিপরীত অর্থবোধক 'পাঠ' পাওয়া গেলে বুঝিতে হইবে, আমরা বাহ্যত যে অর্থ ঠিক বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা ভুল। ইহা অসম্ভব যে কুরআনের একাংশ অপরাংশের বিরপীত হইতে পারে। এইভাবেই একটা প্রদত্ত 'পাঠের' সঠিক অর্থ সহজে নির্ণয় করা যায়। যে অর্থ অন্যান্য আয়াত দ্বারাও সাব্যস্ত হয় সেটাই সঠিক অর্থ। সত্য ও সঠিক অর্থের চিহ্ন হইল ইহাই যে, কুরআন করীমের মধ্যেই ইহার সত্যতার সাক্ষ্যদাতা এক বাহিনী মজুদ থাকে।

দ্বিতীয় নীতি হইল, পবিত্র রসূল (সঃ) যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন বলিয়া সঠিকভাবে জানা যায় তাহাই ঠিক। কুরআনকে সবচাইতে অধিক বুঝিতেন আমাদের প্রিয় ও

সম্মানিত নবী করীম (সঃ) তাহা কে সন্দেহ করিতে পারে? যে অর্থ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, বিনা দ্বিধায় ও বিনা সংশয়ে সেই অর্থ গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উচিত। যদি কেহ তাহা না করে, তাহা হইলে তাহার বিশ্বাসের অভাব আছে। ধর্ম-নিরপেক্ষ দার্শনিক বুদ্ধির প্রতি তাহার আকর্ষণ বেশী।

তৃতীয় নীতি হইল, পবিত্র রসূল (সঃ)-এর সাহাবীগণ বিষয়টির কি অর্থ করিয়াছেন। সাহাবীগণ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছ হইতে সরাসরি আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছিলেন। যে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি বিতরণের জন্য নবী করীম (সঃ) আসিয়াছিলেন, তাহা গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহারাই ছিলেন প্রথম সারিতে। তাঁহারাই খোদাতা'আলার বিশেষ অনুগ্রহভাজন ছিলেন। পবিত্র কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝিতে সহায়তা করার জন্য খোদাতাআলার সাহায্য তাঁহাদের নিত্য সহচর ছিল। তাঁহারা শুধু পড়িতেন আর অর্থ করিতেন এমন নহে, বরং তাঁহাদের জীবন-যাপন পদ্ধতি সম্পূর্ণ 'কুরআনসম্মত' ছিল। কুরআনের প্রতিটি অংশ তাঁহাদের কাজে-কর্মে প্রতিফলিত হইত।

চতুর্থ নীতি ঃ তেলাওয়াতকারীর (পাঠকের) পবিত্র প্ররিস্রুত বিবেক। যে কোনও অংশের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বুঝিতে হইলে ইহাকে ভালভাবে পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করিতে হইবে, বিবেকের সাহায্যে। কেননা, কুরআন এবং পূত-পরিস্রুত বিবেকের মধ্যে এক অনন্য সাধারণ ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে। আল্লাহ্ বলেন -

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ অর্থাৎ কেহই স্পর্শ করিতে পারে না ইহাকে (পবিত্র কুরআনকে) যদি সে পূত-পবিত্র না হয় (৫৬ঃ৮০)। কেননা, পবিত্র কুরআনের সত্যগুলি কেবল তাহাদেরই নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, যাহারা পবিত্র হৃদয় লইয়া ইহা বুঝিতে চেষ্টা করেন। কুরআনের সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী এবং পুণ্যাত্মার মধ্যে আত্মীয়তা বা এক প্রকারের অনুকরণ ও একাত্মতা আছে, যেন উভয়ে এক তন্ত্রীতে বাঁধা। সত্য অর্থ পুণ্যবানের মনে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। যখন ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, তখন পুণ্যমনা পাঠক এইগুলিকে সহজেই চিনিতে পারেন। তাহারা তখন সঠিক অর্থের গন্ধ ও সন্ধান পান এবং ইহাতে পৌঁছাইতে পারেন। তাহাদের বিবেক বলিয়া উঠে, এইতো পাইয়াছি সঠিক অর্থ। সুতরাং বিবেকের জ্যোতিঃ মূল্যবান, নীতি-নির্ণয়ক পার্থক্যকারী, তাহা দ্বারা কুরআনের সঠিক অর্থে পৌঁছানো যায়। যে ব্যক্তি পূর্ববর্তী নবীগণের চিরাচরিত সুদৃঢ় ও সোজা পথে চলে নাই, তাহার পক্ষে কুরআন জানার ভান করা ঠিক নহে। ঈমানের ফলশ্রুতি হিসাবে যে ব্যক্তি এ পর্যন্ত কোন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করেন নাই, তাহার পক্ষে তো নয়ই। এইরূপ করা অহংকার ও ধৃষ্টতা বৈ কিছুই নহে। ইহা তাহার আবিষ্কৃত অর্থ হইবে, যাহাকে তফসীর বির-রায় বলা হয় অর্থাৎ ব্যক্তিগত মতের ভিত্তিতে কৃত

অর্থ। এইরূপভাবে অর্থ করিতে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বারণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন- من فسر القرآن برايه فاصاب فقد اخطاء

'যে ব্যক্তি কেবল নিজের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া কুরআনের তফসীর করে, সে নিজে ইহা লইয়া সন্তুষ্ট হইলেও সে কদর্থই করিয়াছে'।

পঞ্চম নীতি ঃ পবিত্র কুরআনের ভাষা আরবী, আরবগণ যেভাবে সেই ভাষা ব্যবহার করিতেন। অবশ্য এই নীতির উপর খুব বেশী জোর দেওয়া ঠিক হইবে না, কেননা কুরআনের মাঝেই অর্থ বুঝিবার চাবিকাঠি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সেই জন্য ভাষার গভীরে প্রবেশ ও অন্বেষণ করার প্রায় প্রয়োজন হয় না। তবে বুঝিবার ধারাকে স্পষ্টতর করিবার জন্য এই অন্বেষণ কাজে আসে। সময় সময়, ভাষার ব্যবহারিক জ্ঞান, পবিত্র কুরআনের গোপন অর্থ দৃষ্টি পথে আনিয়া দেয়। ইহাতে গুপ্ততত্ত্ব আবিষ্কার করা সম্ভব হইতে পারে।

ষষ্ঠ নীতি-নির্ধারক হইল প্রকৃতির বিধান। বাহ্য জগতের নিয়ম কানুন ও আত্মিক জগতের বিধি-মালার মধ্যে নিকটতম সামঞ্জস্য ও সমান্তরালতা বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই একটা অপরটাকে বুঝিতে সাহায্য করে।

সপ্তম নীতি নির্ণয়ক হইল- আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অর্থাৎ ওলী আল্লাহ্গণের ওহী-ইলহাম এবং মোহাদ্দাসগণের দিব্য-দর্শন। (আল্লাহ্র নিকট হইতে যাঁহারা সংবাদাদিসহ বাক্যালাপের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন, তাহাদিগকে মোহাদ্দাস্ বলা হয়)। এই নির্ণয়কই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণিক ও চূড়ান্ত*। মোহাদ্দাস পর্যায়ের

---

* সৈয়দ সাহেব তাঁহার কোন পুস্তকেই এ কথা স্বীকার করেন নাই যে, ওহী-ইলহাম সত্যতা নির্ধারক এবং এ রূপ করার ইচ্ছাও তাঁহার নাই। কিন্তু কেন? মনে হয় এই জন্যই যে, সৈয়দ সাহেব ওহী ইলহামকে তেমন সম্মানের চোখে দেখেন না। তাহা একজন নবীর প্রাপ্তই হউক আর একজন ওলী আল্লাহ্র প্রাপ্তই হউক। তাঁহার মতে সর্ব প্রকারের ওহী-ইলহাম মানব প্রকৃতির মেজায ও প্রবণতার অংশ বিশেষ। তাই তাঁহার এই মত বিশেষের উপর এখানে কিছু বলা কর্তব্য মনে করি। প্রথমেই বলিতে চাই যে, সেসব ওহী-ইলহাম আল্লাহ্র কাছ কাছ হইতে আসে, প্রকৃতি-প্রদত্ত একটা প্রবণতা বা দক্ষতা বলিয়া সেইগুলিকে উড়াইয়া দেওয়া শুধু একটা ভ্রান্তিই নয় বরং একটা মহাভ্রম যাহা মানবকে সত্য হইতে বহু দূরে সরাইয়া লইয়া যায়। প্রকৃতি মানুষকে নানা প্রকারের প্রবণতা দান করিয়াছে। উহারা সকলেই পরস্পরের সাক্ষ্য এবং একই প্রকৃতিকে প্রকাশ করে। কতক লোক আছে, যাহারা গাণিতিক বিদ্যার প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখায়,সংখ্যা ও অংকের প্রতি তাহাদের ঝোঁক বেশী। অনেকে আছে, ঔষধ বিদ্যার প্রতি তাহাদের আকর্ষণ বেশী। আবার কাহারো তর্ক বিদ্যার প্রতি, কাহারো বা আস্তি-নাস্তি যুক্তির প্রতি অনুরাগ অধিক। তথাপি, ঝোঁক বা প্রবণতা থাকাই কোন ব্যক্তিকে এ প্রবণতার সুদক্ষ পূর্ণতায় পৌঁছাইয়া দিতে পারে না। এই ঝোঁক একটা লুক্কায়িত ক্ষমতা, যাহা প্রচ্ছন্ন থাকে এবং শিক্ষকের দ্বারা ইহা বিকশিত হইয়া থাকে। যখন এই প্রবণতা ও ঝোঁকগুলি সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের হাতে পড়িয়া সুশিক্ষিত ও ধারালো হইয়া উঠে, তখনই মানুষ গণিত বিদ্যা শিক্ষাবিশারদ, সংখ্যাতত্ত্ব বিশারদ, সুদক্ষ চিকিৎসক, তর্কবিদ্যা বিশারদ ইত্যাদি হইয়া

বাণীপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাঁহার শিক্ষা গুরু ও প্রভু পবিত্র রসূল (সঃ)-এরই প্রতিচ্ছবি ও প্রতিবিম্ব। একজন মোহাদ্দাস নবীর ভূমিকাই পালন করিয়া থাকেন। তফাৎ এই যে, তিনি নিজে কোন ধর্মীয় অধ্যাদেশ জারী করেন না। তিনি তাঁহার প্রভু পবিত্র রসূল (সঃ)-এর ইচ্ছা ও শিক্ষা, খোদার কাছ হইতে দিব্যভাবে প্রাপ্ত হন। আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ ও অনুগ্রহে, তিনি নবী করীম (সঃ)-এর আধ্যাত্মিক বরকত ও ফযলের অংশীদার হন। তিনি স্বকীয় ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হইয়া কথা বলেন না। বরং অন্তর্দৃষ্টি ও অভিজ্ঞানের ভিত্তিতে কথা বলেন। তিনি দেখেন ও শুনেন। আল্লাহ্‌কে দেখা ও আল্লাহ্‌র বাক্য শোনা এই পবিত্র রসূল (সঃ)-এর উম্মতের জন্য খোলা আছে। এত বড় আধ্যাত্মিক মহামানবের কেহ সত্যিকারের অকৃত্রিম উত্তরাধিকারী থাকিবে না, তাহা কখনও হইতে পারে না। এরূপ উত্তরাধিকারী কাহারা হইতে পারেন? নিশ্চয়ই ঐ সব লোক নহে, যাহারা নিজেকে ইহ জগতের কাছে বিক্রয় করিয়া দিয়াছে, যাহারা এই জগতের চাকচিক্য উপভোগে মত্ত এবং ইহ জগতে নাম ধামের জন্য জীবন যাপন করে। এই বিষয়ে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অতি পরিষ্কার। আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যাহা নবীগণের রাখিয়া যাওয়া উত্তরাধিকারী-রূপ সম্পত্তি, কেবলমাত্র পবিত্রাত্মাগণই তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অন্যরূপ চিন্তা করা পবিত্র জ্ঞানের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন বৈ আর কিছুই নহে। শুধু ইহাই নহে। যে লোক ইহকালের ভাবনা চিন্তায় নিমগ্ন, তাহার পক্ষে নিজেকে পবিত্র রসূল (সঃ)-এর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী মনে করা কখনও ঠিক নহে। আবার, নবীগণের সঠিক উত্তরাধিকারীর আগমনকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করাও ঠিক নহে।

বুদ্ধিমান শিক্ষক কি করেন? তিনি যখন কোন বিষয়ে কাহারো ঝোঁক আবিষ্কার করেন, তখন তিনি তাহার ঐ ঝোঁক বাড়াইবার উপযুক্ত কাজ দেন এবং তাহাকে উৎসাহ দিতে থাকেন। কবিও বলিয়াছেন ঃ ہر کسے را بہر کارے ساختند ٭ میل طبعش اندراں انداختند

অর্থাৎ 'প্রত্যেক মানুষ তাহার বিশিষ্ট প্রবণতা লইয়া জন্মায়, তাহার ঝোঁক তাহার মধ্যে প্রকৃতিই প্রোথিত করিয়া দেয়'। শিক্ষা লাভ ও প্রশিক্ষণই প্রকৃতিদপ্ত সুপ্ত প্রবণতাকে, যাহা বীজের মত লুক্কায়িত থাকে, চারা গাছের মত গজাইয়া তুলে এবং এইভাবেই তাহার শক্তি বিকশিত হয়। তখন এক ধরনের সূক্ষ্ম-চিন্তা ও সূক্ষ্ম-তত্ত্ব তাহার মনে করাঘাত করে। নূতন ভাবধারা যাহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে তাহার মনে উদিত হয়, ইহাকে ওহী বা ইলহাম বলা যাইতে পারে। কারণ সকল ফলপ্রসূ নূতন ভাবধারা আমাদের মনে আল্লাহ্‌ই স্থাপন করেন।

আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝٩ 'তিনি (আল্লাহ্) ইহার (আত্মার) কাছে প্রকাশ করিয়াছেন, কি ইহার জন্য মন্দ এবং কি ইহার জন্য ভাল (১১ঃ৯)। ভাল ও মন্দের যে জ্ঞান মানবের মনে আপনা হইতেই আসিয়া যায়, তাহা সত্য সত্যই আল্লাহ্‌র কাছ হইতে আসে। ইহা দিব্যজ্ঞান। অবশ্য মানুষের মধ্যে ভাল মন্দ আছে। ভাল মানুষ ভাল বিষয়ের উপর অধিক চিন্তা করেন, তাই ভাল জিনিস তাহার মনে উদয় হয়। মন্দ মানুষ মন্দ বিষয়ের উপর বেশী চিন্তা করে, তাই তাহার মনে উদয় হয় মন্দ জিনিস। মূলতঃ এই যে বিভিন্নতা, ইহা মানব প্রকৃতির বিভিন্নতা। ভাল মানুষের মহান রচনাবলী ও হিতকর

একথা মনে করাও ভুল যে, নবুওয়তের রহস্যাবলী শুধু বিশ্বাসের পর্যায়ে থাকুক, ইহা এখন আর বাস্তবে নাই বরং অতীতের গর্ভে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের সামনে ইহা নাই। ইহার অভিজ্ঞতা লাভ করা আর সম্ভব নহে। এমনকি উহার আবছা উদাহরণও আমরা পাইব না। যদি এই কথাই সত্য হইত, তাহা হইলে ইসলাম জীবন্ত ধর্ম থাকিত না। বরং অন্যান্য মৃত ধর্মের মত, ইহাও এক মৃত ধর্ম হইয়া যাইত। নবুওয়তের সমগ্র বিষয়টাই অতীতের ব্যাপার হইয়া একটা স্মৃতি ও বিশ্বাসের বস্তুতে পরিণত হইত। কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা সেইরূপ পরিকল্পনা করেন নাই। তিনি ভালভাবে জানেন, যদি মোহাদ্দাস পর্যায়ের ঐশী-ওহী ও অনুপ্রেরণা চিরদিন জারী না থাকে, তাহা হইলে ইসলামের সত্যতার ধারাবাহিক সাক্ষী ও নবুওয়তের জাজ্বল্যমানতা, যাহা ওহী-ইলহামের অস্বীকারকারীগণকে নিস্তব্ধ করিয়া দেয়, তাহা কোথা হইতে আসিবে? অতএব, তিনি তাহা জারী রাখিয়াছেন। মোহাদ্দাস কাহারা? যাহারা আল্লাহ্‌র বাণী প্রাপ্ত হন, তাহারাই মোহাদ্দাস। তাহাদের মন ও আত্মা নবীগণের মন ও আত্মার সহিত নিগূঢ়ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নবুওয়তের স্বরূপকে জানার চিরস্থায়ী উপায় ও চিহ্ন হিসাবে তাহাদের অভিজ্ঞতা কাজ করিয়া থাকে। এই ব্যবস্থা এইজন্যই রাখা হইয়াছে, যাহাতে ওহী-ইলহামের আগমনের বিষয়টা প্রমাণহীন প্রাচীন কাহিনীতে পর্যবসিত না হয়। এই কথা মোটেই সত্য নহে যে, প্রাচীনকালের নবীরা সব গত হইয়া গিয়াছেন। আর তাঁহাদের পরে তাঁহাদের উত্তরাধিকারীরূপে কেহই আসিবেন না। তাঁহাদের সম্বন্ধে কথা বলা মানে মৃত ও বিগতদের সম্বন্ধে গল্প-

---

বক্তৃতামালা এই প্রকৃতিদত্ত প্রবৃত্তির ফলশ্রুতি। আর মন্দ মানুষের মন্দ ও অশ্লীল লিখন-বচন তাহাদের মন্দ প্রবৃত্তির ফল। এসব কথা সবই সত্য। কিন্তু যে-সব প্রত্যাদেশ নবীগণ প্রাপ্ত হন তাহাও কি একই শ্রেণীর? এইগুলিও কি প্রকৃতির প্রেরণা যাহা অন্যান্যদের প্রাকৃতিক প্রবণতা ও প্রেরণার মতই কি অনুশীলন ও স্বতঃস্ফূর্ততার দ্বারা ধারালো করা যায়? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে মহা বিপদ হইবে। নবীগণের প্রত্যাদেশ যদি প্রাকৃতিক অনুপ্রেরণারই ফল হইয়া থাকে, তাহা হইলে নবী ব্যতীত অন্যান্য যারা ওহী-ইলহাম পাইয়া থাকেন বলিয়া জানা যায়, তাহাদের সাথে নবীগণের পার্থক্য নির্ণয়ের উপায় কি? সৈয়দ সাহেব হয়ত বলিবেন, সশব্দ প্রত্যাদেশ বলিয়া একটি জিনিষ আছে। কুরআনের প্রত্যাদেশ সশব্দ প্রত্যাদেশ, শাব্দিকভাবে প্রাপ্ত। আমার মনে হয় সৈয়দ সাহেবের তর্কের ধারা আমি বুঝিয়াছি। তবে আমরা যেরূপভাবে শাব্দিক প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করি, সৈয়দ সাহেব কিন্তু সেইরূপ শাব্দিক প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করেন না। সাধারণতঃ প্রত্যেক প্রকারের অনুপ্রেরণা বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আগত ভাবধারা শাব্দিক হয়, শব্দারত হয়। শব্দ বর্জিতভাবে বা অশাব্দিকভাবে অর্থময় কিছুই আসে না। আবার শব্দের ধ্বনিতেও পার্থক্য আছে। আল্লাহ্‌র বাণী কুরআন ও পবিত্র রসূল (সঃ)-এর বাণী হাদীসের শাব্দিক পার্থক্য লক্ষ্য করুন। এই পার্থক্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এত গুরুত্বপূর্ণ যে, ইহারই বলে আমরা বুঝিতে পারি, এই দুইটি একই উৎস হইতে আগত নহে। কুরআন এক উৎস হইতে আসিয়াছে, আর হাদীস অন্য উৎস হইতে। হাদীসের বাণীগুলি সাধারণতঃ ভাব-বাণী হইতে অধিকতর বৈশিষ্ট্যমন্ডিত।

গুজব করা। নবীগণের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী **প্রতি শতাব্দীতেই আসিতেছেন। এই খাকসারও সেইরূপ একজন, এই শতাব্দীতে আসিয়াছে। আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে সংস্কারকরূপে পাঠাইয়াছেন। আমাদের সময়ের মুসলমানগণের বিশ্বাস ও চিন্তায় যে-সব বিভ্রান্তি ও ভুল অনুপ্রবেশ করিয়াছে, ঐগুলিকে শুদ্ধ ও সংশোধন করা এবং দূরীভূত করা আমার কাজ**। এই মারাত্মক ভ্রমগুলি সংশোধন খোদাতাআলার বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতিরেকে সম্ভব ছিল না। অবিশ্বাসীদের কাছে জীবন্ত খোদার জ্বলন্ত নিদর্শন তুলিয়া ধরার এবং ইসলামকে যিন্দা ধর্মরূপে প্রমাণ করার ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। বিশ্বাসীগণকে পুনরায় সঠিক ও জীবন্ত বিশ্বাসে ফিরাইয়া আনার জন্য কোন পন্থাই নাই। যদি নূতন নিদর্শনাবলী প্রদর্শনের মাধ্যমে ইসলামের মাহাত্ম্য ও সত্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে এই পন্থায়ই তাহা করিতে হইবে। আর এই সবই করা হইতেছে। কুরআনের সৌন্দর্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে। আল্লাহ্‌র বাক্যের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী ও গভীরতর সত্য প্রকাশ পাইতেছে। আল্লাহ্‌র নিদর্শন, মোজেযা ইত্যাদি দেখা যাইতেছে। ইসলামের সৌন্দর্য ও নেয়ামতসমূহ এবং ইহার আলোকজ্জ্বল প্রভাব খোদাতাআলা নিত্য নিত্য দেখাইতেছেন। যদি কাহারো চক্ষু থাকিয়া থাকে, তাহারা দেখুন। যাহারা সত্যিকার অন্বেষণকারী, তাহারা আসুন এবং প্রশ্ন করুন। যদি এইরূপ কেহ থাকেন, যাহারা খোদাকে ও তাঁহার পবিত্র রসূল (সঃ)-কে ভালবাসেন, সে ভালবাসা যত ক্ষীণই হউক, তাহারা আসুন, পরীক্ষা করুন এবং নিরীক্ষণ করুন। তারপর এই জামা'ত, যাহা

ভাব-বাণী বা অনুপ্রেরণা বলিতে সাধারণভাবে সচরাচর যাহা বুঝায় আর যাহা আমরা স্বীকার করি, সেই সাধারণ ভাব-বাণীর তুলনায় হাদীসের শব্দগুলি আসমানী বা ঐশী বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ ও আল্লাহ্ কর্তৃক উদ্বুদ্ধ। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত আমাদের এই অভিমত সমর্থন করে ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى

'এবং তিনি নিজের অভিলাস হইতে কোন কথা বলেন না, বরং যাহা বলেন প্রত্যাদেশ পাইয়াই বলেন' (৫৩ঃ৪-৫)।

আমরা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, অনুপ্রেরণা যে প্রকারেরই হউক না কেন, শাব্দিকভাবে আসে। একজন কবি যখন এক লাইনের সহিত আরেকটি লাইনের মিল খুঁজিতে চেষ্টা-রত থাকেন এবং এই অবস্থায় তাহা পাইয়া যান, অনুপ্রেরণা, স্বতঃস্ফূর্ততা বা অন্য যে কোন উপায়েই তাহা পান না কেন, তিনি তাহা শব্দারতভাবেই পান। অতএব, ইহা ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে যে, দার্শনিক সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ ও কবিগণ যে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া থাকেন, তাহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আসে এবং শব্দাকারেই আসে। আর ইহাকেই ব্যাপক অর্থে শাব্দিক অনুপ্রেরণা বলা যায়। ধার্মিকেরা এবং অধার্মিকেরা ইহা সমভাবে পাইয়া থাকেন। তাহাদের নিজ নিজ ভাল-মন্দ প্রবৃত্তি ও বাসনা অনুযায়ী তাহারা তাহা পাইয়া থাকেন। যে-ব্যক্তি রেল ইঞ্জিন তৈরী করিয়াছিলেন, তিনি অনুপ্রেরণা প্রাপ্ত ছিলেন। যে-ব্যক্তি বিদ্যুৎ-প্রবাহ আবিষ্কার করেন তিনিও অনুপ্রাণিত

খোদাতাআলা নিজের অনুমোদন দ্বারা স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে যোগদান করুন। কেননা, আল্লাহ্‌র মনোনীত জামাত ইহাই।

ওহী বা খোদাপ্রাপ্ত বাণী সম্বন্ধে এইরূপ মনে করা অতি মারাত্মক ভুল যে, উহা অতীতে সাধু সজ্জনকে ভূষিত করিত। উহা এখন আর নাই, নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। উহাতে পৌঁছার দরজা চিরতনে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেইরূপ ইহাও মারাত্মক ভুল যে, নিদর্শন এখন আর দেখানো যায় না বা দোয়া এখন আর কবুল হয় না। আত্মিক শক্তির প্রতি এইরূপ চিন্তাধারা প্রতিবন্ধক বিশেষ। ইহা বরণ আধ্যাত্মিক মৃত্যু আনয়ন করে। আল্লাহ্‌র কৃপা-করুণা জান্নাত হইতে নামিয়াছে। ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিও না। উঠ, পরীক্ষা কর ও বিচার কর। তোমরা যদি দেখ যে, যিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, তিনি সাধারণ স্তরের লোক, সাধারণ বুদ্ধি রাখেন, সাধারণ কথা-বার্তা বলেন, তাহা হইলে তাহাকে গ্রহণ করিও না। কিন্তু যদি তাহার মাঝে অসাধারণ কিছু দেখ, যদি আশ্চর্যজনক কিছু পাও, যদি আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রাপ্ত ও শক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় তাহার মাঝেও সেই জ্যোতিঃ ও চমক দেখিতে পাও, কেবল তখনই হ্যাঁ, কেবলমাত্র তখনই তাহাকে গ্রহণ কর। ইহা নিশ্চিত জানিও যে, খোদার মহা কৃপা এই যে, তিনি ইসলামকে পৃথিবীর অন্যান্য মৃত ধর্মের সাথে এক কাতারে রাখিতে চাহেন না। তিনি দেখিতে চাহেন, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যাহা নিশ্চিত বিশ্বাস উৎপন্ন করিয়া অনুসারীকে সত্যিকারের ঐশী জ্ঞানে ভূষিত করে এবং অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তকারীগণের সাথে যুক্তি দিয়া মোকাবিলা করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকে। এই পথ ইসলামের জন্য

এক্ষেত্রে আমরা যে সমস্যায় উপনীত হই সৈয়দ সাহেবের চিন্তার ক্ষেত্রে তাহা প্রযোজ্য। যদি সৈয়দ সাহেব বলেন যে, নবী-রসূলগণ, বৈজ্ঞানিকগণ, বিশ্বাসীগণ ও অবিশ্বাসীগণ সকলেই অনুপ্রেরণামূলক অভিজ্ঞতার দিক দিয়া একই প্রকারের, পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, নবীগণের অনুপ্রেরণা সর্বদাই সত্য হয়, বৈজ্ঞানিকদের তাহা হয় না, তাহা হইলে সৈয়দ সাহেবের স্বীকৃতি মতে, অনুপ্রেরণা নবীগণের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে একই, তফাৎ শুধু এই যে, নবীগণের অনুপ্রেরণা ভ্রম হইতে মুক্ত। এরিষ্টটুল, প্লেটো ও অন্যান্য দার্শনিকগণ অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তবে তাহাদের অনুপ্রেরণা ভ্রান্তি-মুক্ত ছিল না। ইহা হইবে একটা উক্তি মাত্র, যাহা যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য করা যায় না। সৈয়দ সাহেবের এই যুক্তিহীন ভাবধারা মানিয়া লইলে এই কথাও মানিতে হইবে যে, দার্শনিকদের লিখায় বিদ্যামান রাশি রাশি ভাল ভাল জিনিস, সত্য সত্য বাণী, সুন্দর সুন্দর হিতোপদেশ, নৈতিক সুস্থ দৃষ্টি যাহা ভ্রম-মুক্ত ও কুরআনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাহা সবই ঐশী মানে ও গুণে কুরআনের সমকক্ষ, আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ হইতে শাব্দিকভাবে প্রাপ্ত, যেরূপভাবে কুরআন আল্লাহ্‌তাআলা হইতে প্রাপ্ত। তারপর দার্শনিকদের লিখায় যেখানে ভুল আছে, তাহাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যে, ইহা বিচারের ভুল, যাহা নবীগণও করিতে পারেন। তাহা হইলে, দার্শনিকগণকে এমন কি অবিশ্বাসী দার্শনিকগণকেও নবীগণের পর্যায়ভুক্ত করিতে হইবে। এইরূপ বিপদজ্জনক চিন্তা-ধারা ইসলামী বিশ্বাসের বিনাশসাধনকারী। সৈয়দ সাহেব এমনধারা চিন্তা করিতে থাকিলে, ইহা সম্ভব যে, তিনি বিশ্বাসহারা হইয়া পড়িবেন এবং একদিন বলিয়া বসিবেন,

খোলা রহিয়াছে। মনে করুন আপনি যদি এমন এক ব্যক্তির সাথে বাক্যালাপ করেন, যে পবিত্র রসূল (সঃ)-এর ওহী-ইলহাম (খোদার বাক্য) প্রাপ্তিকে অবিশ্বাস করে এবং মনে করে যে, ইহা মায়া বিশেষ, তাহা হইলে আপনি কিভাবে, কোন্ যুক্তি বলে তাহাকে তাহার এই ভ্রম বিশ্বাস হইতে বাহির করিয়া আনিবেন? বলুন কিভাবে, যদি আপনি কোন ওহীপ্রাপ্ত জীবিত ব্যক্তির উদাহরণ তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে না পারেন? ইহা সুসংবাদ না মন্দ সংবাদ, যদি লোকদিগকে বলা হয় যে, ইসলাম আসিয়া কয়েকবার আধ্যাত্মিক জীবন উপভোগ করিয়া মরিয়া গিয়াছে, আর উহার জীবনের প্রস্রবণগুলির ধারা চিরতরে শুকাইয়া গিয়াছে? সত্যধর্ম কি এইরূপভাবে বাঁচিতে পারে? না, কখনও না। সত্য ও জীবন্ত ধর্ম মৃতকল্প হয় না। অতএব, কুরআনের ব্যাখ্যার ব্যাপারে এইগুলিই হইল সঠিক নীতিমালা।

সৈয়দ সাহেবের তফসীরের অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সাতটি নীতিমালার তোয়াক্কা করা হয় নাই। এখানে আমরা ঐ অংশগুলি চিহ্নিত করিয়া দেখাইতে চাই না এবং আমাদের সমালোচনাও উপস্থিত করিতে চাই না। কেননা, সেটা

নিউটনের মত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা কুরআন হইতেও উচ্চস্তরের ভাব-বাণীর অধিকারী ছিলেন।

আফসোস, সৈয়দ সাহেব যদি কুরআনের ব্যাখ্যার জন্য কুরআনেরই প্রতি অধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে তিনি এমন মারাত্মক উপসংহারে উন্নীত হইতেন না। কুরআন নিজেই উহার বাণীগুলিকে উপর হইতে আগত বৃষ্টি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। পৃথিবী হইতে উদ্ভুত বলিয়া কখনও করে নাই। সৈয়দ সাহেব যদি এমন কোন ব্যক্তির সহিত আলোচনাও করিতেন, যিনি ওহী-ইলহামের ব্যাপারে বিশেষ বুৎপত্তি বা অভিজ্ঞতা রাখেন, যিনি ওহী-ইলহাম কি এবং কিভাবে নামিয়া আসে, তাহা পরিষ্কারভাবে জানেন, তাহা হইলে তিনি এই সাংঘাতিক ভ্রম হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন। সৈয়দ সাহেব নিজে তো ভুল করিলেনই, তদুপরি এই ভুল ব্যাখ্যা প্রচার করিয়া তিনি বহু মুসলমানের বিশ্বাসকে চূরমার করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে অজ্ঞেয়বাদী বা নিরীশ্বরবাদীতে পরিণত করিয়াছেন। ঐশী ওহী বা ইলহামকে উহার স্বকীয় স্তম্ভমূল হইতে টানিয়া নামাইয়া তিনি ইহাকে প্রকৃতি-দত্ত প্রবণতা বা স্বতোদ্বগত চিন্তার সাথে এক স্থানে রাখিয়া দিয়াছেন। এইরূপ স্বতঃ উদিত বা অনুপ্রেরণা প্রাপ্তির ব্যাপারে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে কোন তারতম্য নাই।

শুধু খোদাকে সন্তুষ্ট করার মানসে, আমি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে চাই, হয়তবা আল্লাহ্‌তাআলা সৈয়দ সাহেবের প্রতি তাঁহার দয়া ও করুণা প্রদর্শন করিতে পারেন।

প্রিয় সৈয়দ সাহেব, আমি পবিত্র মনে মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, সূর্যের কিরণ যেভাবে আসিয়া দেওয়ালে পতিত হয়, খোদার ওহী তেমনিভাবে মানুষের হৃদয়ের উপর আসিয়া পতিত হয়। ইহা আমার নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা। যখন ওহী আসার সময় উপস্থিত হয়, তখন সর্বপ্রথম আমি অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থা প্রাপ্ত হই। এই অবস্থায় আমি পরিবর্তিত মানুষে পরিণত হই। আমার জ্ঞানে থাকে,

আমাদের বিষয় নয়। সৈয়দ সাহেব প্রাকৃতিক বিধিসমূহের সম্বন্ধে এত কথা বলেন, অথচ তাঁহার তফসীরে তিনি এইগুলি বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সব চাইতে বড় কথা এই যে, ওহী (ইলাহী প্রত্যাদেশ) প্রাকৃতিক প্রবণতা বৈ কিছু নহে। জন্মগতভাবে কোন কোন ব্যক্তি এই প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রবণতার অধিকারী হইয়া থাকেন। এইরূপ ওহীপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে ও আল্লাহ্‌র মধ্যে মাধ্যমরূপী কোনও ফিরিশ্‌তা নামীয় এজেন্ট নাই। এরূপ কথা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের দেহ ও দৈহিক মেজায বর্ধনশীল ও উন্নয়নশীল হওয়ার জন্য, আসমানী মাধ্যমগুলি উপর নির্ভরশীল, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। আমাদের শরীরের সংরক্ষণ ও শারীরিক কাজকর্ম সম্পাদন, চন্দ্র, সূর্য ও তারকাবৃন্দের মঙ্গল প্রভাবের উপর নির্ভর করে। আর এই কারণেই আল্লাহ্

আমার বোধশক্তি এবং চেতনাও থাকে। কিন্তু এইগুলি বাহ্যিক অবস্থা মাত্র। যাহা আমি সত্যিকারভাবে বলি, তাহা এই যে, অন্য কোন সত্তা, অতি শক্তিশালী সত্তা, আমাকে পরাভূত করিয়া নিজের হাতের মুঠায় তুলিয়া লইয়াছেন। আমি সম্পূর্ণভাবে পরাধীন হইয়া পড়ি। আমার নিজের ইচ্ছা ও ইচ্ছাশক্তি কোনটাই থাকে না। আমার সর্বাংশ তাঁহারই আয়ত্তে চলিয়া যায় এবং তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী চলে। সাধারণভাবে যাহা আমার, উহার সবটাই তখন তাঁহার হইয়া যায়। এই অবস্থায় যে-সব বিষয়াদি, যেসব সমস্যা বা যেসব চিন্তা আমার মনে ছিল, ঐগুলি খোদার তরফ হইতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া আমার মানসপটে আগমন করে। আল্লাহ্‌তাআলা তখন এইগুলিকে আপন বাক্য দ্বারা আলোকিত করিতে চাহেন। আমার ভাবনাগুলি তখন অপরূপভাবে, এক এক করিয়া আমার সামনে চলিতে থাকে। আমি হয়ত যায়েদ নামক এক পীড়িত ব্যক্তির কথা ভাবিতেছি এবং তাহার পীড়া-মুক্তি হইবে কিনা জানিতে চাহিতেছি, অমনি ঐশী বাক্য আলোক রশ্মির মত নিপতিত হইয়া আমার সমস্ত সত্তাকে আলোড়িত করিয়া দিল। ইহা যাইতে না যাইতেই, অন্য কোন বিষয় বা চিন্তা মনে উদিত হইল। আর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা বাক্য বা বাক্যমালা অনুরূপভাবে নিপতিত হইল। মনে হয় একজন তীরন্দাজ একের পর এক করিয়া ক্রমাগতভাবে উত্থিত লক্ষ্যবস্তুর উপর তীর নিক্ষেপ করিয়া চলিয়াছে। তখন আমার অনুভব এইরূপই হয় যে, আমার প্রাকৃতিক প্রবণতা হইতে ভাবনারাশি বা বিষয়াবলী সারি বাঁধিয়া উত্থিত হইতেছে এবং যে বাক্যাবলী ঐগুলির উপর ঝরিতেছে, তাহা উপর হইতে আসিতেছে। এইকথা সত্য যে, কবিগণ বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে যখন অনুপ্রাণিত হইয়া উঠেন, তখনই বাক্য রচনা করেন। তবে এই দুই অনুপ্রেরণার মধ্যে পার্থক্য অনেক। এইগুলিকে এক প্রকার মনে করা উচিত নয়। কারণ অনুপ্রেরণার গভীর চিন্তা ও প্রচেষ্টার ফল। যখন ইহা আসে তখনও কবি নিজের সম্বন্ধে ও পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকেন। তিনি নিত্যনৈমিত্তিক স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার সীমার মধ্যেই এই অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন ঐশী অনুপ্রেরণা বা ওহী নাযিল হয় তখন অনুপ্রাণিত ব্যক্তির সকল সত্তা খোদাতাআলার কব্‌জার ভিতরে চলিয়া যায়। তিনি সচেতন ও অভ্যস্ত থাকা সত্ত্বেও ঘটনাবলীর উপর তাহার কোন প্রকার আধিপত্য থাকে না। তাহার জিহ্বা যেন তাহার নহে বরং অন্য মহাশক্তির অধিকারে থাকিয়া তাঁহারই ইচ্ছামত কাজ করে। যে অভিজ্ঞতা আমি বর্ণনা করিলাম, ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, মানবীয় অনুপ্রেরণা ও ঐশী-ওহীরূপী অনুপ্রেরণার মধ্যে পার্থক্য কি?

এইগুলিকে মানুষের খেদমতে লাগাইয়াছেন। অবশ্যই এই কথা সত্য যে, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এই মঙ্গল আল্লাহ্‌রই অবদান, তিনি সকল কার্যকরণের চূড়ান্ত পর্যায়ে বিদ্যমান।

কিন্তু এই মঙ্গল আমাদের কাছে বহু কিছুর মাধ্যমে আসে, আল্লাহ্‌র কাছ হইতে আমাদের কাছে একেবারে সরাসরিভাবে আসে না। আমাদের চোখের জ্যোতিঃ অবশ্যই আল্লাহ্‌র দান, যেহেতু আল্লাহ্‌ই চূড়ান্ত হেতু। কিন্তু সূর্য হইল

সর্বশেষে আমি প্রার্থনা করি, মুসলমানের মনে হইতে যেন এই দুর্ভাগ্যজনক প্রকৃতি-নির্ভর চিন্তা ধারা সম্পূর্ণরূপে ধুইয়া মুছিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়, যাহাতে ইহার বিন্দুমাত্রও মনের কোণে না থাকে। ইসলামের নিয়ামত প্রকাশিত হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতিবাদের ধূম্রকুন্ডলী অপসারিত না হইবে।

প্রকৃতির বিধানের তুমি হে পূজারী,
কি দুঃখ-দুর্দশা হায় ঘটালে মোদের,
সবদিকে দেখি শুধু বিপদের রাশি.
এসকলি কারসাজি তোমার হাতের।
তোমার এ আঁকাবাঁকা বিভ্রান্তির পথ
বারেক যে আচমকা করেছে গ্রহণ,
সোজা পথে পুনরায় ফিরে আসা হায়,
ভাগ্যে তার কভু আর হয় না কখন।
যা ঘটেছে, তার 'পরে যবে চিন্তা করি,
এ কষ্টতো তাহা, যাহা মোরা তৈরী করি।

কুরআন শিখিতে মোরা, কিংবা শিখাইতে,
অবহেলা করিয়াছি সেই দিন হতে,
সে হতে মোদের শিরে যাতনার বোঝা
ধীরে ধীরে চাপিয়াছে স্বাভাবিক পথে।

প্রকৃতিতে ভুল নাই, ভুল আমাদের,
ঈমান চলিয়া গেল দূরে চুপিসারে
আমাদের সুবুদ্ধির আলো-দীপ্ত শিখা,
মিলাইয়া গেল অন্ধকারে।

এক বিন্দু জলের উপরে
সবাই আসিয়া করে ভীড়.
সমুদ্র যেখানে আছে, হায়!
সেথা হতে দূরে খোঁজে নীর।

সেই মাধ্যম, যাহা আমাদের চোখে আলো দান করিয়া থাকে। আমাদের বাহ্য জগতে এমন কোন জিনিসই নাই, যাহা সরাসরি আমরা এমনভাবে পাইয়া থাকি, যেন খোদাতাআলা স্বয়ং তাঁহার আপন দয়ার হাত বাড়াইয়া দিয়া দেন। যাহাই

পরকাল নিয়া হাসে বিদ্রূপের হাসি,
তারা বলে হাশর ও পুনরুত্থান,
এগুলি দূরের বস্তু,
মানুষের বুদ্ধি মাঝে নাহি পায় স্থান।

ফিরিশ্‌তার কথা যদি বল তাহাদেরে,
তারা বলে, এইগুলি যুক্তির বাহিরে।
হে সৈয়দ! যত যুক্তিবাদীদের তুমি
বানিয়েছ উৎসাহী নেতা,
মনে রেখো, মনে রেখো, তোমার চরণ
ভুল স্থানে রহিয়াছে পাতা।

তোমারি এ জীবন-সন্ধ্যায়
একি পথ শক্ত হাতে রাখিয়াছ ধরি?
যাও ত্বরা, কর তওবা,
ধর্ম পথ ওটা নয়, এসো তুমি ফিরি।

আমার তো ভয় হয়, এ চিন্তার ফলে,
হয়তবা কোন একদিন
বলিয়া উঠিবে তুমি বেশ জোড়ে শোরে,
আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব চিন্তা সে-ও অর্থহীন।

ছাড় বন্ধু, ছাড় তুমি এরূপ ভাবনা,
খোদার কাজের ক্ষেত্রে দিওনা দখল,
ভাসা-ভাসা চিন্তা করে আল্লাহ্‌র ব্যাপারে
যেই জন, তারে বলে বিকৃত পাগল।

চিন্তা কর যত পার, এতে কিবা লাভ,
উচ্চঃস্বরে চেঁচাবার সময় এ নয়,
বস বন্ধু, বস তুমি এবে,
থাম তুমি একটু সময়।
হে মানব, জ্ঞান চাহ তুমি ?
খোদা হতে চাহ তুমি জ্ঞান?
আল্লাহ্‌র নিগূঢ় তত্ত্ব এতো সস্তা নহে,
সহজেই করিবে তা পান!

আমরা পাই, তাহাই কোন না কোন মাধ্যমের মারফত পাই। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ বা পূর্ণ শক্তিসম্পন্ন নহে। ইহারা স্বাধীনভাবে, সাহায্য ব্যতীত, নিজের কার্য সম্পাদন করিতে পারে না। ইহারা সৈয়দ সাহেবের অনুমিত প্রাকৃতিক প্রবণতারূপ প্রত্যাদেশ-সদৃশ বস্তু নহে। বাহিরে উদ্দীপক যথা সূর্য ইত্যাদি, ইহাদের কাজের সহায়ক, বাহিরের উত্তেজক ইহাদের কাজ সম্পাদনের জন্য দরকার, সৈয়দ সাহেব যাহা বলেন, উহার অনুরূপ কিছু বাহ্য জগতে বাস্তবে নাই।

সৈয়দ সাহেবের চিন্তাধারা অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যও তাঁহার চিন্তাধারার বিপরীত। আমার অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য সৈয়দ সাহেবের ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। গত এগারো বৎসর যাবত এই খাকসার ঐশী ওহী পাইয়া আসিতেছি। আমি ইহা ভালভাবে ও সুনিশ্চিতভাবে জানি যে, ওহী উপর হইতে অবতরণ করে। এ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। জগতের ঘটনাবলীর মধ্যে তাহা ইহার নিকটতম সদৃশ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, যাহা হইল বিদ্যুতের প্রবাহ। বিদ্যুৎ প্রবাহে কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটিলে, সাথে সাথে নিজেই তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। আমার নিজের ওহী প্রাপ্তির অভিজ্ঞতা, তথা সকল ওহীপ্রাপ্ত সাধু পুরুষগণেরই অভিজ্ঞতা এই যে, ওহী ভিতর হইতে উদিত হয় না। ইহার বিপরীত, যখন ইহা আসে, তখন বাহিরের প্রবল পরাক্রান্ত এক বিজয়ী মহাশক্তি আমাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে নিয়া নেয় এবং আমার সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। কোন কোন সময় এই শক্তি এমনই প্রবল হয় যে, ইহার আধ্যাত্মিক আকর্ষণ আমাকে একেবারে মুহ্যমান করিয়া ফেলে। আমি ইহার প্রতি অবারিতভাবে আকৃষ্ট হই। এইরূপ মুহূর্তে আমি সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বলভাবে আল্লাহ্‌র বাক্য শুনিতে পাই। সময় সময় আমি বাণী বাহক ফিরিশ্‌তাকেই দেখিতে পাই*। আমি তখন এক অনুপম সত্য অভিজ্ঞতার বিরাট প্রভাব ও মহিমা অনুভব করি। যেসব বাণী আমি প্রাপ্ত হই, তাহা প্রায়শঃ অদৃশ্য বস্তু বা অজানা ঘটনাবলী সম্বন্ধে হইয়া থাকে। এই অভিজ্ঞতার উৎস সম্পূর্ণভাবেই আমার বাহিরে থাকে। ইহা এতই শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান যে, ইহা ঐশী না হইয়া পারে না। আর, ইহা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের একটি প্রমাণ। ইহাকে অস্বীকার করা মানে একটা প্রকাশ্য সত্যকে অস্বীকার করা।

সৈয়দ সাহেবের এখন উচিত, মৃত্যুর পূর্বেই তিনি যেন এই সত্যকে এইভাবেই বিশ্বাস করিয়া নেন। কেননা, ঐশী প্রত্যাদেশ অর্থাৎ ওহী-ইলহামের প্রতি অসম্মান দেখানো কোন মতেই ঠিক হইবে না।

আশ্চর্যের ব্যাপার ইহাই যে, প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রাকৃতিক নিয়ম ও আধ্যাত্মিক নিয়মের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিতে পান না। ইহা দেখিবার সামর্থ্য থাকা উচিত যে, আলো আকাশ হইতে আসে। সব উৎসের

* ঐ সময় ফিরিশ্‌তাকে যে কেবল দেখা যায় তাহাই নহে। বরং তাঁহারা নিজেরা প্রকাশ করিয়া বলে যে, বাণী বাহকরূপে তাঁহারা আসিয়াছেন।

চূড়ান্ত উৎস ও সব কারণের চূড়ান্ত কারণ তিনি, তিনি আমাদের বাহ্যিক দেহ অঙ্গ-প্রতঙ্গ, ইন্দ্রিয়সমূহ ও মাংসপেশী ইত্যাদিকে বিভিন্ন ঐশী মাধ্যমের সাহায্যে প্রভাবিত করিয়া থাকেন। এই হিতকারী প্রভাবসমূহ বা অনুগ্রহসমূহ, বহু কারণ পরম্পরার মধ্য দিয়া ছাড়া; অন্য কোনভাবে আমাদের কাছে পৌঁছায় না। ইহাই সত্য। অতএব, আধ্যাত্মিক নিয়মের বেলায়, আল্লাহ্‌তাআলা আধ্যাত্মিক মাধ্যমগুলিকে একেবারে বাদ দিয়া সরাসরি আমাদের কাছে পৌঁছিয়া যাইবেন, ইহা হয় না। প্রাকৃতিক জগতে প্রাকৃতিক মাধ্যম কাজ করে। হ্যাঁ, হাজার হাজার মাধ্যম কাজ করে। বিশ্ব-বিধান বহু কারণ পরম্পরার মধ্য দিয়া আমাদিগকে প্রভাবান্বিত করে। অবশ্য চূড়ান্ত বিচারে আদি কারণ হইতেই এই প্রভাবগুলির উৎপত্তি হয়। এই বিষয়টি আমরা আমাদের পুস্তক" তৌজিহে মারাম" (উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা) এবং "আইনায়ে কামালতে ইসলাম" (ইসলামের সৌন্দর্য মালার দর্পণ) -এ আলোচনা করিয়াছি। ঐ পুস্তকগুলি পড়িয়া দেখা উচিত। বিশেষ করিয়া ফিরিশ্‌তা ও ফিরিশ্‌তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইসলামের ধারণা কি, এ বিষয়ে দ্বিতীয় পুস্তকটিতে এত বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে যে, আর কোন কিতাবেই এমনভাবে পাওয়া যাইবে না।

খোদা সম্বন্ধে সৈয়দ সাহেবের ধারণার ব্যাপারে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি মনে করেন, চূড়ান্ত ও প্রকৃত নিয়ামক আল্লাহ্‌ সৃষ্ট জীবের কার্যাবলীর উপর সার্বভৌমত্ব রাখেন না এবং তাহাদের কাজে হস্তক্ষেপ করার কোন ক্ষমতাও রাখেন না। সৈয়দ সাহেব মনে করেন না যে, প্রত্যেক বিষয় ও বস্তুর উপর ক্ষমতাবান খোদার ক্ষমতা থাকা উচিত। হ্যাঁ, পূর্ণ ক্ষমতা থাকা উচিত। সমস্ত সৃষ্ট-জীবের সর্বপ্রকার কার্যে, যে কোন সময়ে, যে কোনভাবে বাধা প্রদানের বা হস্তক্ষেপের ক্ষমতা না থাকিলে, ইহাকে ক্ষমতা বা প্রভুত্ব বলা চলে না। খোদার ক্ষমতা তো সর্বময় ও অসীম ক্ষমতা। তিনিই সকলের সৃষ্টিকর্তা। 'সৃষ্টি' কথাটির মধ্যেই এই বিষয় নিহিত আছে যে, স্রষ্টার অশেষত্বের অনুপাতে, তিনি অসীম ক্ষমতা নিজ হাতে রাখিয়াছেন, যাহাতে সৃষ্ট-বস্তুর জীবনে অবাধে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন এবং যাহাতে এই কথা বলা যাইতে না পারে যে, আল্লাহ্‌ হিসাবে তাঁহার ক্ষমতা এখন আর নাই, তামাদি হইয়া গিয়াছে*।

আর্য হিন্দুদের ধারণা অন্য রকম। তাহাদের ধারণা এই যে, ঈশ্বর আত্মাসমূহের সৃষ্টিকর্তা নহেন, সকল অণু-পরমাণুরও নহেন। আল্লাহ্‌ না করুন,

* আমরা যদি একথা স্বীকার করি যে, অসীম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌ তাঁহার সৃষ্ট প্রকৃতির কাজে সীমাহীনভাবে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা রাখেন, তখন একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আমরা তাহা হইলে বস্তুর গুণাগুণের অপরিবর্তনীয় স্থায়িত্বের ব্যাপারে নিশ্চিত হইতে পারি কি? আমরা কি ভাবিব যে, নিজের ক্ষমতা বলে পানির গুণাগুণকে রহিত করিয়া আল্লাহ্‌ সেই স্থলে বায়ুর গুণাগুণকে স্থাপন করিয়া দিবেন? অথবা বায়ুকে ইহার গুণাগুণ হইতে বঞ্চিত

এই কথা যদি সত্য মনে করা হয়, তাহা হইলে সেইরূপ ঈশ্বরতো কোন কিছুতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার হইতেও বঞ্চিত। সৃষ্টির প্রারম্ভে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন, কিন্তু ইহার পর পরই তাঁহাকে এই ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। সত্য খোদার সহিত যে মহা সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব বিজড়িত, ক্ষমতাচ্যুত এইরূপ খোদা তাহা পাইবেন কিনা সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। তবে ইসলামের আল্লাহ্ সেই রকম নহেন। ইসলামের আল্লাহ্ অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি অণু-পরমাণুর সৃষ্টিকারী, আত্মাসমূহের সৃষ্টিকারী, সকল জীবের ও সকল জগতের সৃষ্টিকারী। তাঁহার ক্ষমতার সীমা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে উত্তরে ইহা বলাই যথেষ্ট যে, সর্বপ্রকারের সৃষ্টির উপর সর্বময় ক্ষমতা তিনি রাখেন। ব্যতিক্রম শুধু একটি মাত্র ক্ষেত্রে, যেখানে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ তাঁহার ঐশী পরিপূর্ণ প্রকৃতির পরিপন্থী ও স্বীয় জারীকৃত চালু হুকুমের বিপরীত। একটা অজুহাত দেওয়া হয় যে, আল্লাহ্‌র ক্ষমতা থাকিতে পারে, কিন্তু সেই ক্ষমতা তিনি ব্যবহারে না-ও লাগাইতে পারেন। কিন্তু এই

করিয়া তদস্থলে আগুণের গুণাগুণ স্থাপন করিবেন? অথবা তাঁহার জানা গুপ্ত কারণগুলিকে একটু এদিক-ওদিক ব্যবহার করিয়া অগ্নি-প্রকৃতিকে পানি-প্রকৃতিতে পরিবর্তন করিবেন? অথবা মাটির গভীর স্তরে বিপত্তি সৃষ্টি করিয়া ইহাকে সোনায় রূপান্তরিত করিবেন বা সোনাকে মাটিতে?

আমরা যদি এইরূপ ভাবি, তাহা হইলে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, এমতাবস্থায় প্রকৃতির নিয়মশৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং বিজ্ঞান ও কলা কিছুই থাকিবে না। ইহার উত্তর এই যে, এইরূপ ভাবাই ভুল, অত্যন্ত ভুল। আল্লাহ্‌তাআলার প্রজ্ঞায় তাঁহার অসীম রহস্যের অন্তরালে বিভিন্ন ধরনের শত শত পরিবর্তন ও রূপান্তর হইয়াই চলিতেছে। ধরুন এই পৃথিবী, ইহাতে পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটিতেছে এবং মৃত্তিকা নূতন নূতন গুণাবলী লাভ করিতেছে ও নূতন নূতন বস্তু প্রদান করিতেছে, এখন আর্সেনিক, এখন আলোকদীপ্ত পাথর, কখনও বা সোনা, রূপা, হীরক ইত্যাদি। অদ্রূপ, পৃথিবী-বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া গ্যাস উঠিতে থাকে। আরো কতই না জিনিস অনবরত অস্তিত্বে আসিয়া বাহির হইয়া শূন্যে মিলাইয়া যায়। বরফ, শিলাবৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি সময় সময় উৎপন্ন হয়। এখনও প্রমাণিত হইয়াছে যে, উচ্চাকাশ হইতে ভস্মকণা পড়িয়াছে। পরিবর্তন ও রূপান্তর হইয়াই চলিয়াছে। এতদ্‌সত্ত্বেও আমাদের বিজ্ঞানের মূল্য ও সত্য কমে নাই। ইহা দ্বারা প্রকৃতির শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয় নাই। আপনি বলিবেন, এই পরিবর্তনের ও রূপান্তরের মৌখিক উপাদান পূর্ব হইতেই ছিল এবং বস্তুর প্রকৃতির মধ্যেই ছিল। আমরাও তাহাই বলি। আমরা যেসব পরিবর্তন ও রূপান্তরের কথা বলি, উহার ভিত্তি বস্তুর প্রকৃতিতেই নিহিত আছে। সত্য বিশ্বাসও আমাদিগকে ইহা মানিতে বলে। আল্লাহ্ এক, তাঁহার সৃষ্ট সকল জীব ও যাহা কিছু এই বিশ্ব চরাচরে আছে, উহারা চূড়ান্ত বিচারে এক সৃষ্টির সামগ্রিক একত্ব, স্রষ্টার একত্বকেই প্রকাশ করে। এই পরিবর্তনশীলতা আল্লাহ্‌র একত্ব ও তাঁহার অসীম ক্ষমতা হইতেই আসে। কেবল একটি মাত্র ব্যতিক্রম আছে, সেটা হইল (মানুষের) আত্মা। আত্মার গুণ ও দোষের কারণে, পরকালে স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়, উহারা পরিবর্তিত হয় না। এই বিষয়ে আল্লাহ্‌র ওয়াদা এই خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا অর্থাৎ তাহারা সেখানে স্থায়ীভাবে থাকিবে (৪:৫৮)। এই ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত স্পষ্ট।

অজুহাতের কোন মূল্য নাই। বরং তাহা অসম্ভব। কেননা, তাহার গুণনিচয়ের মধ্যে একটি গুণ রহিয়াছে এই যে, كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۝ "তিনি নিত্য-নতুন মহিমায় প্রকাশিত (৫৫ঃ৩০)। পানির শীতলকরণ ক্ষমতা এবং আগুনের প্রজ্বলন ক্ষমতা রহিত করা বা স্থগিত রাখা তাহার পূর্ণতম প্রকৃতির বিপরীত নহে কিংবা পূর্ব-প্রদত্ত কোন আদেশের পরিপন্থী নহে। আমরা কে, যে এ বিষয়ে মীমাংসা দান করি এবং বলি যে, এখন আল্লাহ্ জিনিসের গুণাবলীতে পরিবর্তন সাধন করেন না? আমাদের একথা বলার কি কারণ বা যুক্তি আছে? আল্লাহ্র অসীম ক্ষমতার উপর আমরা কি করিয়া সীমা টানিতে পারি এবং এইভাবে তাঁহার পরিপূর্ণ স্বকীয় প্রকৃতির মাঝে ঘাট্তি সৃষ্টি করিতে পারি? তাহা ছাড়া, এইভাবে আল্লাহ্র ক্ষমতার অর্থহীন সীমানা টানিয়া এবং তাঁহার পূর্ণ সত্তায় হ্রাস করিয়া আমাদের লাভই বা কি হইবে। মনে হয় এইসব ব্যাপারে লিখিবার সময়ে সৈয়দ সাহেব নিজের দুর্বল অবস্থার কথা অবহিত ছিলেন। তাই নিজের দুর্বল অবস্থাকে

আত্মার প্রকৃতি অপরিবর্তনশীল, ইহা খোদার নির্দেশ। ইহা ছাড়া সৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু আছে, পরিবর্তন এড়াইতে পারে না। পরিবর্তনই নিয়ম। ইহা সব স্থানেই এবং সব কিছুতেই ক্রিয়াশীল। এতই ক্রিয়াশীল যে, বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রতি তিন বৎসরে মানব দেহে একবার পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। শরীরের পুরাতন অণুগুলি অদৃশ্য হইয়া যায় এবং সে স্থানে নতুন অণু দেখা দেয়। পানি, অগ্নি পরিবর্তিত হয়। অন্ততঃ এরূপ দুইভাবে ঃ কিছু অংশ অদৃশ্য হয় এবং নতুন অংশ আসিয়া সেইগুলির স্থান নেয়। যে অংশ বা যে অণু অদৃশ্য হয়, সে নতুন গুণ লাভ করে এবং উহার সুপ্ত ক্ষমতার অণুপাতে নতুন অস্তিত্ব লাভ করে।

এই মরণশীল পৃথিবী অবিরাম পরিবর্তনের এক অন্তহীন দৃশ্যপট। আর ইহা আল্লাহ্র চিরস্থায়ী, অপরিবর্তনীয় বিধান। যাহা ঘটিতে থাকে, তাহা অন্তর্দৃষ্টি দিয়া দেখিতে পারিলে, ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, এই পরিবর্তন, আর যাহা পরিবর্তিত হয়, উহারা চূড়ান্ত পর্যায়ে সকলেই এক। যে উৎস হইতে উহারা এই গুণরাশি লাভ করে তাহা এক। মানুষ কখনও এই পরিবর্তনের ও রূপান্তরের পূর্ণ জ্ঞান লাভে সমর্থ নহে। সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তাঁহার সৃষ্টির রহস্যাবলী ও সূক্ষ্ম তাৎপর্যের জ্ঞানের গভীরে কাহাকেও শরীক করেন নাই।

আপনি হয়ত প্রশ্ন করিবেন, নৈসর্গিকমন্ডলেও কি পরিবর্তন ঘটে? আমার উত্তর, হ্যাঁ। সেখানেও পরিবর্তন ও লয়ের পালা বিদ্যমান। আমরা জানি না সেটা অন্য কথা। সে জন্যই সবকিছু একদিন বিলীন ও নিঃশেষ হইয়া যাইবে। আমাদের জগত হইতেই আমরা সাক্ষ্য পাই যে, জগৎ জোড়া পরিবর্তন বিদ্যমান। আমরা ইহা জানি এবং দেখিতেও পাই মহাবিশ্বের অন্যত্রও যে পরিবর্তন ঘটে, তাহা আমরা পরে দেখতে পাইব। অতএব, ধৈর্য হারাইবেন না تو کار زمیں را نکو ساختی کہ با آسماں نیز پرداختی۔

"দুনিয়ার কাজ ভালভাবে সম্পাদন করিয়াছ তো? এখনি উর্ধ্ব দুনিয়াকে ঠিক করিতে চাও!" পরিবর্তন, রূপান্তর, ভিন্ন পদার্থে পরিণত হওয়া, নিত্য দিনের অভিজ্ঞতা। আর এই গুলি মহিমান্বিত চূড়ান্ত একত্বের প্রয়োজনেই ঘটিয়া থাকে বলিয়া মনে হয়। যাহাতে এই পরিবর্তন, উৎস ও মূলের একত্বকে নির্দেশ করিতে থাকে। যাহাতে আল্লাহ্তাআলার

শক্তিশালী করিবার জন্য তিনি অন্য একটা দুর্বল যুক্তি বা ওজর সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ স্বয়ং এই প্রাকৃতিক দৃশ্যমান বিষয়গুলি বর্ণনা করিয়াছেন, যেমন অগ্নি দগ্ধ করে, পানি শীতল করে, সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয় ও পশ্চিমে অস্ত যায় ইত্যাদি। এই বর্ণনাগুলি নিশ্চয় আজও সত্য, কিন্তু সৈয়দ সাহেব মনে করেন যে, এইগুলি আল্লাহ্র চূড়ান্ত নির্দেশ বা প্রতিশ্রুতি বিশেষ, তাই অপরিবর্তনীয় ও চিরস্থায়ী।

এই যদি সৈয়দ সাহেবের যুক্তি হয়, তাহা হইলে পবিত্র কুরআনের অনেক স্থলেই অর্থ করিতে তাহাকে অতিশয় বেগ পাইতে হইবে এবং তিনি বলিতে বাধ্য হইবেন যে, পবিত্র কুরআনের সকল বিবৃতিই চিরস্থায়ী, অপরিবর্তনীয় প্রতিজ্ঞা-বাণী। উদাহরণস্বরূপ হযরত যাকারিয়ার কাছে আল্লাহ্র প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ আমরা তোমাকে এক শিশু পুত্র দিব, প্রতিজ্ঞা করিতেছি (১৯:৮)। ইহা দ্বারা কি এই বুঝায় যে, প্রতিশ্রুত শিশু ইয়াহিয়া সব সময় শিশুই থাকিবেন? ইয়াহিয়াকে প্রতিশ্রুতির মাঝে শিশু বলা হইয়াছে। তাই প্রতিশ্রুতির ইয়াহিয়া শিশুই থাকিবেন। এইরূপ যুক্তির অসংগতি আরো অনেক স্থলে উদ্ভব হইবে, যাহা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে সময়ের অপচয় হইবে। এই কথা সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রত্যেকটি বিরতি যাহা কোন এক সময়ের জন্য যুক্তিযুক্ত, বা একজনের কাছে অন্যজনের এক সময়ে দেওয়া একটি প্রতিজ্ঞা (সৈয়দ সাহেবের যুক্তি-মূলে), সব সময়ের জন্যই যুক্তিযুক্ত হইবে, ইহা সঠিক নহে। এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে একটা সরল বিরতি দানের জন্য কি সৈয়দ সাহেব বিবৃতিদানকারীকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের দোষে দোষী সাব্যস্ত করিবেন?

সার্বভৌমত্ব ক্ষমতার আওতায় বিশ্ব জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু পূর্ণভাবে আসিয়া যায়। অতএব, এই আপত্তি যে, অস্বাভাবিক পরিবর্তন প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও ব্যতিক্রম ঘটাইয়া বিজ্ঞানাদিকে অসম্ভব করিয়া তুলিবে, তাহা টিকিতে পারে না। যখন আমরা বলি আগুনকে দিয়া পানির কাজ করাইবার শক্তি খোদার আছে এবং পানিকে দিয়া আগুনের কাজ, তখন আমরা এই কথা মনে করি না যে, তিনি এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন উপায় অবলম্বন করিবেন না এবং তাঁহার অসীম প্রজ্ঞাকে প্রয়োগ করিবেন না। ইহা নহে যে, তিনি সরাসরি আদেশ দান করিয়া এই পরিবর্তন ঘটাইয়া দিবেন। আল্লাহ্তাআলা এমন কিছুই করেন না যাহাতে প্রজ্ঞা নাই। আর এইরূপই হওয়া উচিত। আগুনের দ্বারা পানির কাজ বা পানির দ্বারা আগুনের কাজ নেওয়ার কথা বলিতে আমরা ইহা বুঝাই যে, আল্লাহ্ 'মাধ্যম দ্বারা' পরিবর্তন সাধন করতঃ এইরূপ কাজ সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং ইহাতে তাঁহার চূড়ান্ত প্রজ্ঞা নিয়োগ করেন, যাহা বিশ্ব-জগতের প্রতি অণুকণিকার উপর আধিপত্য রাখে। আমরা ইহা জানি বা না জানি, বুঝি বা না বুঝি, তাহাতে কিছু আসে যায় না। তখন দৃশ্যমালা ও উহাদের পরিবর্তনাদি প্রজ্ঞার বিধি ও উদ্দেশ্যকে অনুসরণ করে, তখন উহারা আমাদের বিজ্ঞানের ইতি টানে না। বরং এই পরিবর্তনের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা সাধিত হইয়া থাকে। পানিকে বরফ এবং বিদ্যুৎকে আলোতে রূপান্তরণ দৈনিক অভিজ্ঞতার ব্যাপার।

ইহা ভাল হইবে, যদি সৈয়দ সাহেব তাঁহার অপসৃয়মান জীবনের শেষ প্রান্তে এই অধমের সান্নিধ্যে আসিয়া কয়েকটা মাস বাস করেন। কারণ আমি 'সংস্কারক' নিযুক্ত হইয়াছি। আমার কর্তব্য হইল, আমার যুগের লোকজনের কাছে আনন্দের সুসমাচার পৌঁছাইয়া দেওয়া। আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি, সৈয়দ সাহেবের অসুবিধাগুলি দূরীভূত করার জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি যত্ন সহকারে মনোনিবেশ করিব। আমি আশা করি এবং বিশ্বাস রাখি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাহাকে এমন নিদর্শন দেখাইবেন যাহাতে প্রাকৃতিক বিধানের প্রতি তাহার অদ্ভুত বিশ্বাস একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। এইরূপ অলৌকিক ক্রিয়া কান্ড আমার হাতে অনেক সংঘটিত হইয়াছে, যাহা সৈয়দ সাহেবের প্রাকৃতিক বিধানের সাথে সামঞ্জস্যহীন। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, সৈয়দ সাহেব বলিবেন, প্রাকৃতিক বিধানের বিপরীত অনেক চিহ্নই তো দেখিতে পাওয়া যায়। সেইগুলি বর্ণনা করিয়া কি লাভ হইবে? সৈয়দ সাহেব এইগুলিকে নিছক কিস্‌সা-কাহিনী বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। অন্যান্য জিনিসও সৈয়দ সাহেবের স্বীকৃতি আদায় করিতে পারিবে না। এমনকি ওলী-আল্লাহ্‌গণের ইলহামীভাবে প্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহও না। তাঁহার মতে আগুনের দাহিকা শক্তি লোপ পাওয়ার মত এইগুলিও প্রাকৃতিক বিধানের বিরোধী। অতএব, বিশ্বাসযোগ্য নহে। আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করা, আর আশা করা যে, দোয়ার বরকতে ঈপ্সিত বস্তু হাসিল হইবে, ইহাও সৈয়দ সাহেবের মতে প্রাকৃতিক বিধানের বিরোধী কথা।

অতএব, সৈয়দ সাহেব যদি আসিতে ও আমার সহিত থাকিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি কি আমাকে অনুমতি দান করিবেন, যাহাতে আমি শেষোক্ত দুই বিষয়ে অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণী ও দোয়ার বিষয়ে আল্লাহ্‌র ফয়সালা প্রার্থী হই এবং

আরেকটি কথা উল্লেখযোগ্য ও স্মরণযোগ্য। সাধু পুরুষগণের এরূপ আশ্চর্য ঘটনাদি জানা যায় যে, তাঁহারা পানিতে পড়িলেন অথচ ডুবিলেন না। আগুনে পতিত হইলেন, অথচ পুড়িলেন না। এইসব মোজেযার আসন্ন রহস্য হইল এই যে, আল্লাহ্-প্রদত্ত শক্তি যাহা তাহারা অর্জন করিয়াছেন, ইহার প্রভাবে অতি সূক্ষ্মভাবে স্বাভাবিক বস্তুগুণের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়। ইহাও ঐশী প্রজ্ঞার অংশ, যাহার রহস্যাবলীর সীমা-পরিসীমা নাই। এই প্রভাব আসমানী সত্তাদের কাছে হইতেও আসিতে পারে। অথবা, অগ্নির মাঝেই গুপ্তভাবে নিহিত এমন অজানা কোন গুণ আছে যাহা পোড়াইবার শক্তিকে সাময়িকভাবে অচল করিয়া দেয়, অথবা মানব দেহ নূতন কোন প্রকারের প্রতিরোধ শক্তি লাভ করে। অথবা এই সম্ভাবনাগুলির একত্র সমাবেশের কারণেও ইহা ঘটিতে পারে। আগুনের দাহিকা শক্তি সাময়িকভাবে অকার্যকরী হইয়া যায়। সমস্ত ঘটনাটি ঘটে দোয়ার ফলশ্রুতিরূপে অথবা সূক্ষ্ম ধরনের প্রভাবের ফলে। এই হইল অলৌকিক ঘটনা। ইহা না বস্তুগুণের স্বাভাবিক অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটায়, না ইহাতে বিজ্ঞান বিদূরীত হয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা এক নতুন বিজ্ঞানে, যাহাকে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে, তাহাতে প্রবেশ করি। এই বিজ্ঞানের নিজস্ব নীতি ও অনুমিত-সত্য রহিয়াছে। আগুনের দাহিকা শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে অথচ কেবল আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে তাহা সংশোধিত হইয়া কমিয়া যায়। আধ্যাত্মিক প্রভাবাদির ও নিজস্ব রীতি-নীতি রহিয়াছে। উপযুক্ত সময় ও উপযুক্ত পাত্র ভেদে ইহা কার্যকরী হয়।

তৎপর সৈয়দ সাহেব সম্বন্ধে খোদাতাআলা আমাকে যদি কোন কিছু জ্ঞাত করেন, আমি তাহা জনসমক্ষে প্রকাশ করি? এইরূপ করিলে জনসাধারণের অনেক কল্যাণ হইবে। যদি সৈয়দ সাহেবের মতামত নির্ভুল হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্য বিফল হইবে। আর তাহার মতামত ভ্রান্ত প্রমাণিত হইলে সকল যুক্তি-সম্পন্ন মানুষই তাহার ভ্রান্ত-বিশ্বাসের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবে। তাহারা তাহাদের মহা পরাক্রমশীল, মহাগৌরবান্বিত আল্লাহ্‌কে আগের চাইতে বেশী চিনিতে পারিবে। তাহারা তখন তাঁহার প্রতি অধিক ভালবাসার টানে আকৃষ্ট হইবে। যখন তাহারা তাঁহার কাছে দোয়ার জন্য হাত উঠাইবে, তখন তাহারা এই আশায় ভরপুর হইয়াই হাত উঠাইবে যে, তাহাদের দোয়া আল্লাহ্‌র করুণা হইতে বঞ্চিত হইবে না। তাহারা তখন আনন্দ সহকারে দোয়া করিবে এবং প্রার্থনার মধ্যে স্বাদ ও আনন্দ পাইবে। আমরা আমাদের আল্লাহ্‌র কাছ হইতে কি চাই? এইটুকুই যে, তিনি যেন আমাদের প্রার্থনা শুনেন এবং আমাদের ডাকে সাড়া দেন এবং তাঁহার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিজেই আমাদিগকে অবহিত করেন। এমন একজন প্রতিমাস্বরূপ খোদা, যাহার বাণী কখনও আমাদের শ্রুতিগোচর হইবে না, যাহার প্রতাপ কখনও আমরা দেখিতে পারিব না, আমাদের কল্পনা জগতে উঁকি দিয়া সামান্য রেখাপাত করুন, তাঁহার উদ্দেশ্যেই কি আমরা হাজারো রকমের কস্‌রৎ

রহস্যের উপরেও রহস্য এই যে, পূর্ণমানব আল্লাহ্‌র স্বভাবের প্রকাশক। যখনই খোদার প্রকাশ প্রয়োজন, তখনই পূর্ণমানব সেই বিশেষ শক্তি ও প্রভাব লাভ করেন। সব কিছুই তখন তাঁহার ইচ্ছার কাছে নত হয়। এইরূপ মুহূর্তে পূর্ণ মানবকে নরখাদকের কাছে দিলেও কিংবা জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেও তাঁহার কোনও ক্ষতি হইবে না। কেন? কারণ, সেইসব মুহূর্তে আল্লাহ্‌র সত্তা তাঁহার উপর ক্রিয়াশীল থাকে। সব কিছুই মহিমায় আল্লাহ্‌র প্রতি ভীতি লইয়া বসবাস ও চলাফেরা করে।

পূর্ণ মানবের সান্নিধ্যে আসা ছাড়া, এইসব বুঝা কঠিন। ইহা অতিশয় সূক্ষ্ম ও চূড়ান্ত মাত্রায় অস্বাভাবিক। সকলের মন তাহা প্রণিধান করিতে পারে না। তবে মনে রাখিবেন প্রত্যেক বস্তুই খোদার বাণী শুনিতে পায়। তিনি প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করিতে ও চালাইতে পারেন। সব জিনিষের শেষ প্রান্ত তাঁহার হাতে আছে। তাঁহার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অসামান্য, অসীম। ইহা প্রত্যেক বস্তুর মূল ও সার সত্তায় পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। আল্লাহ্‌তাআলার গুণাবলী যেমনি অসংখ্য,বস্তুর গুণাগুণও তেমনি সংখ্যাতীত। যে এই কথায় বিশ্বাস করে না, সে তাহার খোদাকে আবিষ্কার করিতে পারে নাই। সে তাহাদেরই একজন যাহাদের যার সম্বন্ধে কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهٖ তাহারা আল্লাহ্‌কে সেইভাবে জানে না, যেভাবে জানা উচিত (৬ঃ১২)। পূর্ণ মানব নিজেই এক ক্ষুদ্র জগৎ। তাই সময় সময় সারা বিশ্বজগতকেই তাঁহার সেবায় নিয়োজিত করা হয়। আধ্যাত্মিক জগতের তিনি যেন মাকড়সা। বিশ্ব-জগত তাঁহার জাল ও সূতা মাত্র। যখন মোজেযা ঘটে

بکار و بار ہستی اثری ست عارفاں را ؎ ز جہاں چہ دید آں کس کہ ندید ایں جہاں را -

অস্তিত্বের নিত্য কর্মে জ্ঞানী ও গুণীজন, নিজেদের প্রভাব খাটান, ইহ-জগতের জ্ঞানে অভিজ্ঞ যে জন কোথা সে পাইবে বল, পরকাল-জ্ঞান?

করিয়া যাইব? জানিয়া রাখুন এবং নিশ্চিতভাবেই জানিয়া রাখুন, মহাপ্রতাপের খোদা চিরবিরাজমান এবং সকল বস্তুর উপরই তিনি সর্বময় ক্ষমতা রাখেন।

তাঁহার দু'হাত কভু নাহি রহে বাঁধা,
চিরমুক্ত তাঁর হস্তদ্বয়,
যাহা চান তাহা তিনি করেন বাতিল,
চান যাহা তাহাই যে হয়,
সবারি উপরে তাঁর রহিয়াছে ক্ষমতা অক্ষয়

আর আমাদের সর্বশেষ কথা ঃ সব প্রশংসা আল্লাহ্‌তাআলার, তিনি সমস্ত বিশ্বের প্রভু।

প্রেয়সের মুখ-ভাতি আবরিত নয়,
সত্যিকার প্রেমিকের দ্বারে,
ইহা সূর্য, ইহা শশীকলা,
সমুজ্জ্বল আলোর ঝংকার।

অনবহিতের কাছে সে সুন্দর মুখ,
সত্যই তো লুক্কায়িত থাকে,
প্রাণভরা ভালবাসা নিয়ে এসে দেখ,
ঘোমটা খানা খুলে যাবে ফাঁকে।

পবিত্র আঁচল তাঁর অহংকারী জন,
নাহি পারে পরশ
করিতে, দুঃখ বেদনার পথে, বিনয় ব্যতীত
তাঁর কাছে যাওয়া নাহি যায় অন্য পথে।

বিপদ কন্টকে ঘেরা কিনারা ঘেঁষিয়া,
চির প্রিয় ঈপ্সিতের কাছে যেতে হয়,
জীবনের নিরাপত্তা চাও যদি তুমি,
আমিত্ব ও অহংকার কর তবে লয়।

উপযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া পায় নাক নৈকট্য তাঁহার,
অশোধিত যুক্তি কভু কাজে নাহি আসে,
যে-জন এ পথে করে নিজেকে বিলয়,
সেই জন ঠিক পথ পায় অনায়াসে।
কুরআন বুঝিতে চাহ? দুনিয়ার ভোগী হয়ে
হয় না যে এ কাজ সাধন,

এই শরবতের স্বাদ, তাহাদেরই তরে,
আগেই পেয়েছে যারা কিছু আস্বাদন।

আর তুমি! যদি তুমি নাহি জান কিছু
অন্তরের অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান কভু
আমার বিরুদ্ধে তুমি যা বল না কেন,
হব নাক আমি তাতে অসন্তুষ্ট তবু।

সদিচ্ছায় সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে,
যা বলার আমি বলিয়াছি,
বিষদুষ্ট জখমটা সারাবার তরে,
এ মলমে দিয়াছি প্রলেপ।

'দোয়াতে' বিশ্বাস নাই? ইহার এলাজ,
আরো বেশী, বেশী করে দোয়া কর তবে,
মদের কুফল দূর করিবে নিশ্চয়
নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে থাকো যবে।

যদি বল, কোথাও কি রয়েছে প্রমাণ,
দোয়া যেথা কার্যকরী হয়?
তাহলে আমার কাছে দৌড়াইয়া আস
তাহলে আমার কাছে দৌড়াইয়া আস.
মধ্যাহ্ন সূর্যের মত দেখাব তা, না রবে সংশয়।

সাবধান! অবিশ্বাস করিও না কভু,
আল্লাহ্‌র প্রতাপের রহস্য নিচয়ে,
ক্ষান্ত হয়ে দেখ তুমি, গৃহীত দোয়ার
এ নমুনা রবে যাহা চিরঞ্জীব হয়ে-

দোয়া কবুল হওয়ার দৃষ্টান্ত ঃ

মীরাটের "আনীসে হিন্দ" পত্রিকায় আমার ভবিষ্যদ্বাণীর সমালোচনা ঃ

আমি উপরোক্ত পত্রিকার ১৮৯৩ খৃঃ ২৫শে মার্চ তারিখের সংখ্যাখানি পাইয়াছি। ইহাতে পন্ডিত লেখরাম পেশোয়ারীর মৃত্যু সম্পর্কিত আমার ভবিষ্যদ্বাণীর সমালোচনা রহিয়াছে। আমি জানিতে পারিলাম, আল্লাহ্‌র তরফ হইতে প্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে আমার তরফ হইতে প্রকাশ করার কারণে অন্যান্য সংবাদপত্রও মর্মাহত হইয়াছে। ইহাতে আমি আনন্দিত হইয়াছি যে, যাহারা আমার বিরোধী, তাহারাই আমার ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিয়া চলিয়াছে। প্রত্যুত্তরে আমি তাহাদিগকে বলিতে চাই যাহা, যাহা আমি বলিয়াছি বা লিখিয়াছি, তাহা

আল্লাহ্‌র ইচ্ছা মতই বলিয়াছি ও লিখিয়াছি। নতুবা ইহার সাথে আমার ব্যক্তিগত কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু যখন বলা হয়, এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী কোন উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবে না বরং এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিয়াই যাইবে, তখন আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এইসব সমালোচনার সময় এখনও আসে নাই। আমি তো আগেই স্বীকার করিয়াছি এবং এখনও স্বীকার করিতেছি যে, যদি এই ভবিষ্যদ্বাণীর ফল এইরূপ দাঁড়ায় যে, সাধারণ জ্বর হইল, বা সাধারণ ধরনের কোন ব্যথা বেদনা হইল কিংবা কলেরা হইয়া আরোগ্য লাভ করিল, তাহা হইলে আমার ভবিষ্যদ্বাণী,ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াই গণ্য হইবে না। বরং ইহা নিঃসন্দেহে এক ধরনের প্রতারণার প্রচেষ্টা বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপ অসুখ বিসুখ তো হয়ই বরং কেহই এইগুলি হইতে মুক্ত নহে। এইরূপ ক্ষেত্রে, আমি যে শাস্তি গ্রহণ করিবার উল্লেখ করিয়াছি, সেই শাস্তি নিতে আমি বাধ্য হইব। কিন্তু আমার ভবিষ্যদ্বাণী যদি এরূপ বৈশিষ্ট্যের সহিত পূর্ণ হয়, যাহা দেখিলেই খোদার গযব বলিয়া মনে হইবে, কেবল তখনই এই ভবিষ্যদ্বাণীকে খোদার তরফ হইতে আগত বুঝিতে হইবে। ইহা সত্য যে, কেবল দিন তারিখ ও সময় নির্ধারণ করা না করার মধ্যেই এই ভবিষ্যদ্বাণীর মাহাত্ম্য ও ভীতি-বিস্ময়ে নির্ভর করে না বরং ইহাই যথেষ্ট যে, ঘটনার জন্য একটা সময়-সীমা নির্ধারণ করা হইয়াছে। এই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি এই ভবিষ্যদ্বাণী এইরূপভাবে পূর্ণ হয় যে, ইহা সকলের মনে ভয় ও বিস্ময় সঞ্চার করে, তাহা হইলে, ইহা সর্বসাধারণের দৃষ্টি নিশ্চয়ই আকর্ষণ করিবে। সন্দেহ ও সমালোচনা, যাহা এখন প্রকাশ করা হইতেছে, তাহা দূর হইয়া যাইবে এবং ন্যায়পরায়ণ লোকেরা লজ্জাবনত হইয়া তাহাদের সন্দেহ অপনোদন করিবে।

একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার। আমি অধমও একজন মানুষ। অন্যান্যের মতই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। আমি যদি সম্ভাব্য রোগ-শোক, ঘটনা ইত্যাদি ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও আমার সম্বন্ধে অনুরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে। আমি আমার ভবিষ্যদ্বাণীতে মাত্র ৬ (ছয়) বৎসরের সময় নির্ধারণ করিয়াছি। তাহার ভবিষ্যদ্বাণীতে ১০ (দশ) বৎসরের সীমা নির্ধারণ করিলেও আমি মানিয়া নিব। এখন লেখরামের বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসরের বেশী নহে। তিনি যুবক, শক্ত ও সুঠাম দেহের অধিকারী এবং তাহার স্বাস্থ্যও অতি উত্তম। আর আমি পঞ্চাশোর্দ্ধ এক দুর্বল ব্যক্তি। বহুদিন যাবৎ বিভিন্ন রোগে ভুগিয়া আসিতেছি। এই স্বাভাবিক পার্থক্যগুলি থাকা সত্ত্বেও- যাহার প্রত্যেকটিই প্রতিপক্ষের অনুকূলে রহিয়াছে- ইহা পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠিবে, কাহার ভবিষ্যদ্বাণী মানুষের মনগড়া আর কাহার ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ্‌র তরফ হইতে।

সমালোচক মহোদয় বলিয়াছেন, এইসব ভবিষ্যদ্বাণী আজকাল আর তেমন গুরুত্ব বহন করে না। এইরূপ বলা সাধারণ রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু

আমার কাছে ইহাই সত্য মনে হইতেছে যে, আজ কালকার মানুষের মধ্যে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় সত্যগুলিকে গ্রহণ করিবার উদগ্র ইচ্ছা জাগিয়াছে, যাহা অতীতের মানুষের মাঝে তুলনায় কম ছিল। তফাৎ শুধু এই খানেই যে, আজিকার মানুষের কাছে ধোঁকাবাজি তত সহজে প্রশ্রয় পায় না এবং ধোঁকাবাজি করিয়া সহজে পার হওয়া যায় না। সাধু ও সত্য দাবীকারকগণের জন্য ইহা শুভ লক্ষণ। যাহারা আসল ও নকলের মধ্যে প্রভেদ করিতে পারেন, তাহাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন, যাহারা সত্যকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, তাহারা সত্যকে পাওয়া মাত্রই ইহার দিকে ধাবিত হন এবং ইহাকে আলিঙ্গন করেন। সত্য নিজের মাঝে এক আকর্ষণীয় শক্তি রাখে যাহার কারণে লোক ইহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। আমরা যে সময়ে বাস করিতেছি, সেই সময়ের উপর দোষারোপ করা ভুল। এমন শত শত সত্য জিনিষ, যাহা আমাদের পূর্বপুরুষগণ সত্য বলিয়া মনে করিতেন না, আজ সেইগুলিকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করা হয়। এই পরিবর্তন এই জন্যই সম্ভব হইয়াছে, যেহেতু সত্যে উপনীত হইবার জন্য মানুষের ব্যাকুল তৃষ্ণা জন্মিয়াছে। যে সত্য মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহাকে মানুষ ভালবাসে, ঘৃণা করে না। মানুষ এখন অতিমাত্রায় দক্ষ ও চালাক হইয়া গিয়াছে এবং সরল মানুষের পুরাতন যুগ চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ কথা বলা, বর্তমান সময়কে অপমান করা ছাড়া আর কিছুই নহে। বর্তমান সময় কি এতই হীন যে, কোন সত্য সঠিকভাবে প্রমাণিত হইবার পরেও লোকে সত্য বলিয়া মানিবে না? না, না, এইরূপ কথা আমি বলিতে পারি না। কেননা, আমি দেখি যে, শিক্ষিত ও বিশেষজ্ঞরাই আমার কাছে অধিক সংখ্যায় আসেন ও উপকার লাভ করেন। এদের মধ্যে অনেকেই বি, এ, এম, এ, পাশ। এই নব্য-শিক্ষিতদের মধ্যে আমি সত্য গ্রহণের বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষ্য করিয়াছি। ইহার পর মাদ্রাজে বসবাসকারী ইউরেশিয়ান নামীয় একটি ইংরেজ সম্প্রদায় যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা আমাদের বিশ্বাসাবলী গ্রহণপূর্বক আমাদের জামাতে যোগদান করিয়াছেন।

আমার মনে হয়, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা খোদা-ভীরু লোকের পক্ষে বুঝিবার জন্য যথেষ্ট। আর্য সমাজীরা আমার বক্তব্যের উপর স্বাধীনভাবে যেরূপ ইচ্ছা সমালোচনা করুন। এখন ঠিক এই সময়ে, আমার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রশংসা করা আর সমালোচনা করা উভয়ই সহজ। যদি এই ভবিষ্যদ্বাণী ঐশী হইয়া থাকে, যেমন আমি নিশ্চিতভাবে ঐশী বলিয়া জানি, তাহা হইলে ইহা মানুষের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করিবেই। আর যদি ঐশী না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা নিশ্চয় আমার জন্য অপমান বহন করিয়া আনিবে। এবং সেই অপমানকে অযথা ওজর-আপত্তি দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করিলে, তাহা আরো বৃদ্ধি পাইবে। চিরঞ্জীব আল্লাহ্‌, মহা পবিত্র ও মহিমান্বিত আল্লাহ্‌, যাঁহার অধিকারে সব কিছুই রহিয়াছে, তিনি কখনও ভণ্ডকে সম্মানিত করিবেন না।

লেখরামের প্রতি আমার কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ আছে মনে করা নিতান্ত ভুল। কাহারো প্রতি আমার বিদ্বেষ নাই। লেখরাম জাজ্জ্বল্যমান সত্যের প্রতি শত্রুতা দেখাইয়াছে। আধ্যাত্মিক শক্তির মহাউৎস সেই পূর্ণ ও পবিত্র মহামানব (সঃ)-কে সে আক্রমণ ও অপমান করিয়াছে।এই কারণেই আল্লাহ্ তাঁহার গভীরতম ভালবাসার পাত্র মহানবীর সম্মান প্রতিষ্ঠা করিয়া দেখাইবার জন্য এই সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন।

যাহারা সত্যকে অনুসরণ করে, তাহাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

লেখরাম পেশোয়ারী সম্পর্কে আরো কিছু সংবাদ ঃ

আজ ২রা এপ্রিল, ১৯৮৩ খৃঃ, মোতাবেক ১৪ই রমযান, ১৩১০ হিজরী ভোরে আমি অর্ধ-নিদ্রায় ছিলাম, আমি নিজেকে একটি বৃহৎ গৃহে কয়েকজন বন্ধুর সহিত বসা অবস্থায় দেখিলাম। হঠাৎ একজন ভীতি-উদ্দীপক-দৃষ্টিধারী বৃহদাকৃতির লোক উপস্থিত হইল, আমি চক্ষু তুলিয়া দেখিলাম, সে এক অদ্ভুত আকৃতির ও অদ্ভুত প্রকৃতির জীব। তাহাকে মানুষ মনে হইল না বরং সাংঘাতিক কঠোর ও কঠিন ফিরিশ্‌তা বলিয়া মনে হইল। তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা মাত্র হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়। আমি তাহাকে পুরাপুরি দেখিয়া নিবার পূর্বেই, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, লেখরাম কোথায়? সাথে সাথে আর একজনের নাম লইয়া বলিল, অমুক কোথায়? তখন আমি বুঝিতে পারিলাম, লেখরাম এবং অপর ব্যক্তিকে শাস্তি দানের জন্য তাহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। এখন আমার স্মরণ নাই অপর ব্যক্তি কে? তবে এইটুকু মনে পড়ে যে, সে সেই দলেরই অপর এক ব্যক্তি, যাহাকে আমি বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করিয়াছিলাম। সেই দিনটি ছিল রবিবার, সময় ভোর ৪টা। সব প্রশংসাই আল্লাহ্‌র।

ধনী, বিত্তশালী এবং সমাজের উচ্চস্তরের ক্ষমতাশীনদের নিকট আবেদন ঃ

করুণাময় দয়াশীল, আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি। আমরা তাঁহার প্রশংসা করি এবং নবী করীম (সঃ)-এর উপর আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ কামনা করি। হে ইসলামের নেতৃবৃন্দ! আল্লাহ্ আপনাদের হৃদয়কে অন্যদের তুলনায় অধিক নরম করিয়া দিন, যাহাতে আপনারা এই সৎকাজে সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিতে পারেন। আল্লাহ্‌তাআলার প্রিয় ধর্মের এই দুর্দিনে যাহাতে আপনারা ইহার সেবক হইতে পারেন।

আমার অতি জরুরী কথা বলিবার আছে। আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য হিসাবে আমি ইহা বলিতেছি। আমার বলিবার বিষয় এই যে, আল্লাহ্‌তাআলা চতুর্দশ শতাব্দী হিজরীর প্রারম্ভে ইসলাম ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত ও সুমুন্নত করার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। এই সমস্যা-শংকুল সময়ে কুরআনের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য এবং পূত-পবিত্র মহানবী (সঃ)-এর মহানুভবতার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা আমার উপর

কর্তব্য হিসাবে বর্তাইয়াছে। আমার কর্তব্যের মধ্যে ইহাও বর্তাইয়াছে যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টি ও আশীর্বাদ এবং খোদার বিশেষ জ্ঞান ও নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করিয়া ইসলামের শত্রুগণের শত্রুতাকে প্রতিহত করি। এই কাজে আমি গত দশ বৎসর যাবত নিয়োজিত আছি। ইসলামের সত্য প্রচারের এই বহুমুখী কাজের জন্য অর্থের প্রয়োজন, তাই আমি মনে করিয়াছি যে, আল্লাহ্ তাঁহার পবিত্র নবী (সঃ)-এর মাহাত্ম্য প্রচারের পথে যে সব বাধা-বিঘ্ন রহিয়াছে, তাহা আপনাদিগকে অবহিত করি।

প্রচুর পুস্তকাদি প্রকাশ করা এবং বহুলাকারে তাহা প্রচার করা আমাদের একান্ত দরকার। অথচ এতবড় ও ব্যাপক কাজের জন্য আমাদের হাতে অর্থ নাই। ঘটনাক্রমে কোন কোন ভক্তের* বদান্যতাক্রমে একটা পুস্তক প্রকাশ করা হইলেও, ইহার অল্প সংখ্যাই বিক্রয় হয়। মানুষ বড় উদাসীনতা ও অবহেলা দেখাইতেছে। বইয়ের প্যাকেটগুলি আমাদের বাক্সেই পড়িয়া থাকে। অথবা বিনা পয়সায় বিতরণ করিয়া দিতে হয়। বহুল প্রচারের আসল উদ্দেশ্যই তাহাতে ব্যাহত হইয়া যায়। জামা'ত অবশ্যই সংখ্যাগত দিক দিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু ইহা এখনও ধনীলোকদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই, যাহারা আর্থিক খরচের এত বড় বোঝা বহন করিতে পারে। আল্লাহ্ ধর্ম সংস্কারের কার্যকে সংগঠিত করিবার জন্য এই অধমকে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি আল্লাহ্র তরফ হইতে প্রতিশ্রুতি পাইয়াছি, ধনী লোক, এমনকি বাদশাহ্গণ আমার জামাতে শামিল হইবেন। তিনি আমাকে ইলহাম দ্বারা জানাইয়াছেন, 'আমি তোমাকে আশীষের পর আশীষ দান করিব, এত বেশী যে, বাদশাহ্গণও তোমার বস্ত্রাঞ্চল হইতে আশীর্বাদ চাহিবে'। আল্লাহ্র এই প্রতিশ্রুতির উপর ভরসা করিয়াই আমি ধনী, অর্থশালী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণের কাছে আবেদন করিলাম, যাহাতে আমার মিশনের কাজে সাহায্য করার জন্য তাহারা আগাইয়া আসেন। ধর্মের কাজে সাহায্য করা বড় নেকীর কাজ। অবশ্য আমি এই কথা জানি যে, অনেক লোকই সন্দেহ, সংশয় ও ভুল বুঝাবুঝির মধ্যে রহিয়াছেন। আপনাদের বিশ্বাস ও ভক্তির যোগ্য কাহাকে পাইলেই, তখন কুরবানী ও আত্মোৎসর্গের কাজে আগাইয়া আসিবার প্রেরণা পাইবেন। এই জন্যই আমি সাধারণভাবে বিজ্ঞাপন দ্বারা ধনীগণকে আহ্বান জানাইলাম। আমাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করা পর্যন্ত, তাহারা যদি সাহায্য করিতে সংকোচ বোধ করেন, তাহা হইলে তাহারা আমার কাছে

* ধর্মীয় ব্যাপারে উৎসাহী ব্যক্তিগণের মধ্যে আমার ভ্রাতা হযরত মৌলবী হেকিম নূরুদ্দীন সাহেব ভেরবীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার সর্বস্ব, ধন-দৌলত ও মালামাল, ধর্মের নামে বিলাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার পরে উল্লেখযোগ্য, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হেকীম ফযলুদ্দিন ও মালীর কোট্লার নওয়াব মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের নাম। অন্যান্য বন্ধুগণের নামও স্মরণযোগ্য, যাঁহারা ভক্তি-ভালবাসার সহিত বিভিন্ন পর্যায়ের আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন।

লিখুন। তাহারা তাহাদের বিশেষ বাসনা, তাহাদের আপন সমস্যাবলী ও তাহাদের বিবিধ অসুবিধার কথাগুলি নির্দিষ্ট করিয়া জানাইলে, আমি তাহাদের বাসনা পূরণের জন্য এবং তাহাদের সমস্যাবলী দূরীকরণের জন্য দোয়া করিব। কিন্তু তাহাদের প্রথমেই প্রতিজ্ঞা করা উচিত হইবে, ইসলামের খেদমতের জন্য তাহারা কি পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিবেন। তাহারা শপথ করিয়া বলিবেন যে, তাহাদের প্রতিশ্রুতি দৃঢ়, গম্ভীর ও অবশ্য-পালনীয়। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তাহাদের পত্র* ও শপথ-নামা পাইবার পর তাহাদের বাসনা পূরণের জন্য প্রার্থনা করিব এবং আমার বিশ্বাস আছে যে, খোদাতাআলা স্বীয় অসীম প্রজ্ঞায় অন্যরূপ নির্ধারণ না করিয়া থাকিলে বা অন্যরূপ অটল সিদ্ধান্ত পূর্বেই গ্রহণ করা না হইয়া থাকিলে, আমার দোয়া আল্লাহ্ শুনিবেন ও মঞ্জুর করিবেন। আর ইহা মঞ্জুর হইয়াছে বলিয়া পূর্বাহ্নেই আমি খবরও পাইয়া থাকি।

আপনার আশা-আকাঙ্খা সুদূর পরাহত বা জটিল মনে করিবেন না। সব কিছুর উপরই আল্লাহ্র কর্তৃত্ব রহিয়াছে। ব্যতিক্রম শুধু সেই স্থানে, যেখানে আল্লাহ্ তাঁহার অপরিবর্তনীয় আদেশের দ্বারা ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত পূর্বেই করিয়া রাখিয়াছেন। যদি অনেক অনেক পত্র আসিয়া যায়, তাহা হইলে আমি কেবল সেই সব লোকের পত্রের উত্তর দিব, যাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে বলিয়া আল্লাহ্ আমাকে জানাইয়া দিবেন। আমার প্রার্থনা গৃহীত হওয়ার দৃষ্টান্তগুলি, অবিশ্বাসীগণের নিকট আল্লাহ্র নিদর্শনস্বরূপ কাজ করিবে। এমন হইতে পারে যে, এই দৃষ্টান্তের সংখ্যা অনেক হইবে, যাহা মানুষকে সাধারণভাবে, প্রভাবান্বিত করিতে যথেষ্ট হইবে। পরিশেষে আমি প্রতিটি মুসলমানের কাছে একটি উপদেশবাণী পৌঁছাইয়া দিতে চাই, উঠ, ইসলামের জন্য জাগ্রত হও। ইসলাম এখন বিপদাপন্ন, ভীষণভাবে বিপদাপন্ন, সাহায্য লইয়া আগাইয়া আস। বর্তমানে ইসলাম তোমার সাহায্যের মুখাপেক্ষী। আমি কেন এই কথা বলিতেছি? এই জন্য যে, আল্লাহ্ আমাকে কুরআনের জ্ঞান দিয়াছেন এবং পবিত্র গ্রন্থের মধ্যে নিহিত অনেক তাৎপর্যপূর্ণ তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য আমার কাছে প্রকাশ করিয়াছেন। আমার স্বপক্ষে তিনি বহু মোজেযা প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব, আমার কাছে আইস এবং আমার সাথে আল্লাহ্তাআলার কৃপা ও আশীর্বাদের অংশ লাভ করিয়া তোমরাও ধন্য হও।

আমি সেই আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যাঁহার হাতের মুঠায় আমার জীবন ও প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আমি তাঁহার তরফ হইতে ইসলামের

---

* ইহা উচিত হইবে যে, চিঠিগুলি অতি যত্নে পাঠাইতে হইবে; সীল করা অবস্থায় রেজিষ্টারী ডাকে পাঠাইতে হইবে এবং ইহার বিষয়-বস্তু কাহারো কাছে পূর্বে প্রকাশ করা হইবে না। এখানেও এইগুলি পবিত্র আমানতের সহিত রাখা হইবে। যদি কোন ধনী ব্যক্তি প্রতিনিধির মাধ্যমে তাহার পত্রাদি পাঠাইতে চাহেন, তাহা হইলে ইহা আরো ভাল হইবে।

সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রেরিত হইয়াছি। ইহা কি অত্যাবশ্যক ছিল না যে, এই বিপদ-সংকুল, পরীক্ষাময়, শতাব্দীর শিরোভাগে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে কোন মুজাহিদ আসিয়া, তাঁহার ঐশী নিয়োগ ও পবিত্র মিশন, স্বকীয় মোকাম ও মর্যাদা সহ সকলের কাছে আত্ম প্রকাশ করেন? দীর্ঘ সময় অতীত হইবার পূর্বেই আপনারা আমাকে আমার কাজের মাধ্যমে জানিতে পারিবেন। এইরূপভাবে যাঁহারাই আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সব সাময়িক অজ্ঞ আলেম নামধারীগণের বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছেন। অবশেষে তাঁহাকে তাঁহার কাজের মাধ্যমেই চিনা যায় এবং আবিষ্কার করা হয়। তিক্ত ফলের গাছে কখনও সুমিষ্ট ফল ধরে না। সেইরূপ, যে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আসে না, আল্লাহ্‌র অনগ্রহরাজি কখনও তাহার উপর বর্ষিত হয় না। সকল নেয়ামত আল্লাহ্‌র অনুগৃহীতদের জন্যই।

হে মানব, ইসলাম বড় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। শত্রুরা ইহাকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। ইসলামের বিরুদ্ধে অসংখ্য ধরনের আপত্তি ও সমালোচনার ঝড় উঠিয়াছে। এইরূপ আপত্তির সংখ্যা তিন হাজারের মত হইবে। তাই তোমার সাহায্য দ্বারা তোমার ঈমানের পরিচয় দাও এবং আল্লাহ্‌র মন্ডলীতে যোগদান কর।

আল্লাহ্‌র পথ যাহারা অনুসরণ করে, তাহাদের উপর শান্তিঃ স্বজন বান্ধব হারা
ভীষণ একাকী
সাথীহীন আহ্‌মদের দীন
আমরা সবাই মগ্ন নিজ নিজ কাজে,
ধর্মতরে কত উদাসীন।

অধর্মের বন্যাস্রোতে ভাসায়ে নিয়েছে,
শত শত, লক্ষ লক্ষ আত্মা মানবের,
আফসোস ও দুঃখ হয়, সেই চোখ লাগি,
এই দিকে তাকাইয়া দেখে না সে ফের।

কেন এত অবহেলা, ওহে ধনীজন,
কি কারণে এত উদাসীন?
আসলে কি তোমরাই নিদ্রারত আছ,
নাকি, ধর্মই হারায়েছে সৌভাগ্যের দিন?
হে মুসলিম, খোদার কসম তুমি জাগো,
কি যে হীনাবস্থা দেখ তোমার ধর্মের,
সম্মুখে বিপদ মহা দেখিতেছি আমি,
এতই সুস্পষ্ট তাহা, প্রয়োজন নাহি প্রকাশের।

উঠ তুমি হে যুবক, অগ্নির শিখাতে
ইসলামের জামা-বস্ত্র পুড়ে ছাই হয়,
কোন কিছু না করিয়া, দূরে সরে থেকে,
এই দৃশ্য দেখে তোর বিশ্বাসী হৃদয়?

এই সত্য-ধর্মতরে সকল সময়ে,
আমার হৃদয়-রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে,
আমার বেদনা রাশি, এত এত ব্যথা,
অন্তর্যামী ছাড়া কেহ নাহি জানে ওরে।

যে যাতনা ভুগিতেছি আমি, খোদা ছাড়া
আর কেহ জানিবার নহে,
বিষ পান করিতেছি, বাধ্য হয়ে আমি
কি তীব্র বিষ তাহা বলিবার নহে।

অন্যরাও দুঃখ করে দুর্দিন আসিলে,
সাথে থাকে আপনার জন,
কি যে কষ্ট মোর দুঃখে, কেহ নাই সাথী,
একা এ ব্যথির হায় কে আছে আপন!

বহিতেছে রক্তস্রোতে, আমি দেখিতেছি,
কারবালাতে শহীদের যেরূপ ঝরেছে,
এ প্রেমাস্পদের হেন দুর্দশা দেখিয়া,
কেহ নাহি মনে হয় আঁখি মুছিতেছে।

নিজের ভোগের তরে, নিজেদের কাজে,
দু'হাতে খরচ করে আপনারে ঘিরে,
এই বদান্যতা আর এত উদারতা,
অংশ তার যদি দিত আল্লাহ্‌র খাতিরে!

তোমার কি চিত্ত আছে, আছে অর্থ কড়ি?
আছে ইচ্ছা ধর্মের সেবার?
তাহলে যা পার দাও, আমরা ভাবি না
কম বেশী কত দিলে, দাও যা দিবার।
এই আকাশের নীচে খুঁজে তুমি আহা
যে ধর্মের সমতুল পাবে না কোথাও,

দুঃখ লাগে, নির্বোধের আঘাতে আঘাতে,
সে ধর্ম পতিত হয়ে ধূলায় লুটায়।

আমরা দারিদ্র-ক্লিষ্ট, কি করিতে পারি,
ইসলামের হেন অবস্থাতে,
কেবল প্রার্থনা করি, করি মোনাজাত,
জায়নামাযে অশ্রু ঢালি রাতে আর প্রাতে।

হে আমার প্রিয় খোদা, দিও নাক তুমি,
কালো হৃদয়ের মাঝে সুখের পরশ,
ধর্মগুরু আহ্‌মদের ধরমের তরে,
যে পরওয়া করে না, তারে দাও অপযশ।

ওহে দুনিয়ার ভ্রাতা, সুখের জীবন,
পাঁচ সাত দিন, বাগানের তরু শাখে,
কোথাও কি দেখিয়াছ, শুনিয়াছ কভু,
বসন্তের সমারোহ চিরদিন থাকে?

খাকসার
মির্যা গোলাম আহ্‌মদ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ اَفۡضَلِ الرُّسُلِ وَخَاتَمِ النَّبِیّٖنَ

বিজ্ঞাপন

"বারাহীনে আহ্মদীয়া" নামক কিতাবখানি আমি আল্লাহ্‌র দেওয়া কর্তব্য হিসাবে লিখিয়াছি। আল্লাহ্‌ ঈমানের পুনরুজ্জীবন ও পুনস্থাপনের জন্য আমাকে মনোনয়ন করিয়াছেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি আমাকে তাঁহার মোবারক কালাম দ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছেন। এই কিতাবখানার সাথে দশ হাজার টাকার পুরস্কারও ঘোষণা করা হইয়াছে। পুরস্কার ঘোষণার সারকথা এই ঃ

যে ধর্ম আল্লাহ্‌ মানুষকে শিখাইয়াছেন, যে ধর্মের অনুসরণের ফলে মানুষ অদ্বিতীয়, দোষক্রুটিহীন, পবিত্র পরিপূর্ণ ও অসীম ক্ষমতাধিকারী আল্লাহ্‌র প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাসে উপনীত হয়, সে ধর্ম হইল একমাত্র ইসলাম এবং একান্তভাবে ইসলাম। এই ধর্মের সত্যতা সূর্যের মত দেদীপ্যমান। এই ধর্মের আলো দিবালোকের মত উজ্জ্বল। অন্যান্য ধর্ম মিথ্যা। এত মিথ্যা যে, কোন যুক্তি ও বুদ্ধির বিচারের সম্মুখে ইহারা টিকিতে পারে না। এমনকি ঐ ধর্মগুলির নীতিমালা অনুসরণ করিয়া কোন আধ্যাত্মিক শক্তি বা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করাও যায় না। বরং অন্যান্য ধর্মের অনুসরণ মানুষকে আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধ ও কৃষ্ণ হৃদয় করিয়া ফেলে এবং এই কালিমাময় হৃদয়ের অভিব্যক্তি ইহজগতেই দৃশ্যমান হইয়া থাকে। বারাহীনে আহ্মদীয়া পুস্তকে ইসলামের সত্যতা দুইভাবে প্রমাণ করা হইয়াছেঃ (১) ইসলামের সত্য হওয়ার স্বপক্ষে তিনশত জোরালো বুদ্ধিদীপ্ত ও অখন্ডণীয় যুক্তি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, এই যুক্তিগুলির অখন্ডনীয়তা ও দৃঢ়তা ইহাতেই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, ইহার সাথে একটা চ্যালেঞ্জও দেওয়া হইয়াছে। চ্যালেঞ্জটা এই যে, যদি কোন ব্যক্তি এই যুক্তিগুলি খন্ডন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। যে কোন ব্যক্তি সত্যিকার প্রতিযোগী হিসাবে আদালতে দরখাস্ত করিয়া, এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার বিজ্ঞাপন রেজিষ্টারী করিতে পারেন। (২) ইসলামের সত্যতা এমন সব ঐশী নিদর্শনের দ্বারা প্রমাণ করা যায়, যাহা ধর্মের সত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। এই উদ্দেশ্যে এই লেখক তিন প্রকারের নিদর্শনাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন ঃ (ক) ঐ সকল নিদর্শন যাহা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর হাতে শত্রুরা দেখিয়াছিল, যে সকল মোজেযা তাঁহার দোয়ার ফলে, তাঁহার ব্যক্তিগত চৌম্বিক শক্তি বা তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাবে ঘটিয়াছিল। আর ঐ সকল নিদর্শনাবলী যে সত্যি সত্যি প্রদর্শিত হইয়াছিল, লেখক তাহা নিশ্চিত ঐতিহাসিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ

করিয়াছেন। (খ) ঐ সকল নিদর্শন যাহা কুরআনের অবিচ্ছেদ্য অংগরূপে কুরআনের স্বকীয়ত্বেই নিহিত আছে, যাহার সমকক্ষতা করা বা রদ করা আজ পর্যন্তও সম্ভব হয় নাই। এই নিদর্শনগুলি লেখক পরিষ্কারভাবে ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছে। যাহাতে কেহ অভিযোগ করিবার সুযোগ না পায়। (গ) ঐ সকল নিদর্শন যাহা সত্য ধর্ম গ্রন্থের ও সত্য রসূলের অনুসারী কর্তৃকও দেখানো দরকার। কেননা ইহাতে তাহার উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হয়। এই প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই গোলাম অসীম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্তাআলার অনুগ্রহে যে সমস্ত ওহী-ইলহাম প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যাহা অস্বাভাবিকভাবে পূর্ণ হইয়াছে, যে সব অস্বাভাবিক ঘটনাবলী তাহার হাতে ঘটিয়াছে, যে সব অলৌকিক মোজেযা, উজ্জ্বল ভবিষ্যদ্বাণী ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি তাহার মাধ্যমে প্রদর্শিত হইয়াছে, যাহা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ছাড়া কখনও সম্ভব নয়, এবং ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত যে সকল কাশ্ফ 'দিব্য-দর্শন' পূর্ণ হইয়াছে ও যে সকল দোয়া কবুল হইয়াছে এবং এ ব্যাপারে বিরোধী ধর্ম বিশ্বাসীগণের মধ্যেও চাক্ষুস সাক্ষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে–এই সব কিছুই এই কিতাবে আমার স্বকীয় অভিজ্ঞতা রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এই অধমকে ইহাও ওহীর মাধ্যমে জানানো হইয়াছে যে, এই অধম এই যামানার মোজাদ্দিদ। এই যুগের ধর্ম-সংস্কারক। আরো জানানো হইয়াছে যে, এই অধমের আধ্যাত্মিক গুণাবলী ও ক্ষমতাবলী মসীহ্ ইব্নে মরিয়মের আধ্যাত্মিক গুণাবলী ও ক্ষমতাবলীর অনুরূপ; আমরা দুই জন আধ্যাত্মিক গুণ ও শক্তিতে অভিন্ন। আমাকে এই কথাও জানানো হইয়াছে যে, সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও নবীকুল শিরোমনি পুতপুণ্য মহানবী (সাঃ)-এর পুর্ণতম ও বিশ্বস্ততম অনুগমনের ফলশ্রুতিতেই আমাকে অতীতকালের সকল বড় বড় ওলী-আল্লাহ্গণের চাইতেও উচ্চতর মর্যাদার পুরস্কারে ভূষিত করা হইয়াছে। আমাকে জানানো হইয়াছে যে, নাজাত বা পরিত্রাণের উপায়, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উপকার লাভের উপায় রহিয়াছে নবী করীম (সাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণের মধ্যে। আর তাঁহার বিরোধিতার মধ্যে রহিয়াছে আধ্যাত্মিক অধঃপতন, অধোগমন ও বঞ্চনা।

এই সকল যুক্তি ও নিদর্শন 'বারাহীনে আহ্মদীয়া' কিতাবে পাঠ করা যাইতে পারে। ইহার তিনশত ফরমার মধ্যে সাঁইত্রিশ ফরমা ছাপানো হইয়াছে। প্রগাঢ়চিত্ত অনুসন্ধানী ও অনুসন্ধিৎসুগণের পূর্ণ সন্তুষ্টির জন্য লেখক নিজে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করিতেও প্রস্তুত আছে।

আল্লাহ্র কৃপা ছাড়া ইহা কিছু নয়,
গর্বের কিছুই এতে নাই,
যারা সত্য পথ ধরে ইহলোকে চলে,
তাহাদেরে সালাম জানাই।